[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্দেশিত পাঠ্যসূচী অবলম্বনে সকল উচ্চমাধ্যমিক
ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের নবম দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

মনোবিজ্ঞান

নবম দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীসুশীল রায় এম. এস. সি.
মালদা কে. সি. বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং পুরুলিয়া
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক

ও

শ্রীঅঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এস. সি.
লেক বালিকা শিক্ষালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষিকা

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা—বারো

প্রকাশিকা :

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে :

মৃণাল দত্ত

এশিয়া মুদ্রণী

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—বারো

প্রথম প্রকাশ :

ডিসেম্বর, ১৯৬১

আমাদে

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা জগতে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা চলেছে। এর ফলেই গড়ে উঠেছে সর্বার্থসাধক স্কুল। মুদালিয়ার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবংগ মধ্য-শিক্ষা-পর্ষৎ সব স্কুল পাঠ্য বিষয়ের এক পাঠ্য সূচী তৈরী করেন। এই পাঠ্যসূচীতে মনোবিজ্ঞান আর তর্কবিজ্ঞানকে একই ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মনোবিজ্ঞা আর তর্কবিজ্ঞানকে একসংগে পড়ানোর কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। তাদের বিষয়বস্তু তো আলাদা বটেই, তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত যে একসংগে পড়লে তাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার করা হয়। যাই হউক ১৯৬০ সালে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের চেষ্টায় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে পৃথক পৃথক ভাবে এই দুই বিষয়ের পাঠ্যসূচী করেন (Vide circular No HS/2/60; Dated 4th April 1960)। এই সময় থেকে মনোবিজ্ঞান আলাদা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে।

এটা খুবই আনন্দের কথা ছাত্রছাত্রীরা খুব অল্প বয়স থেকে মনোবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও স্কুলে তো দূরের কথা কলেজেও মনোবিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হ'তো। এখন অবশ্য অনেক কলেজেও পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার বহুল প্রচার করে শিক্ষাবিদরা সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলার পথে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনের সকল রকম কাজেই অপরিহার্য। আশা করি এই শিক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ছোট থেকেই নিজেদের জীবন সুন্দর ও সুসংযত করে গড়ে তুলতে পারবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক আ[illegible]বি এবং অভিনন্দনযোগ্য পরিবর্তন। একজন নবম শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে কোন ইংরেজী, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে তার বিষয়বস্তু গ্রহণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই তার জন্য প্রয়োজন তাদেরই মাতৃভাষায়

াকৃত হয় তাহ'লে আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।
কমিশন তাদের রিপোর্টের এক জায়গায় পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে
y good book adequetely covering the syllabus
commended. In selecting a book maximum impor-
ould be attached to attractiveness of presentation and
excellence to treatment.

আলোচ্য বই পাঠ্যসূচীর কেবলমাত্র Theoritical অংশের জন্য লেখা। নানারকম অসুবিধা থাকার জন্য আমরা Practical অংশ এক সংগে দিতে পারলাম না। তবে আশা করছি জানুয়ারী মাসের মধ্যে আমরা এই অংশ প্রকাশ করতে পারবো। এতে ছাত্রছাত্রীদের যে অসুবিধা হবে তার জন্য আমরা দুঃখিত। সাধারণতঃ Practical ক্লাস ফেব্রুয়ারী মাসের আগে আরম্ভ করা হয় না। আমরা তার মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌঁছে দিতে পারবো।

পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বইকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করে রাখা হ'য়েছে। প্রথম খণ্ড নবম শ্রেণী, দ্বিতীয় খণ্ড দশম শ্রেণী আর তৃতীয় খণ্ড একাদশ শ্রেণার জন্য। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে কিছুটা প্রত্যক। তবু সব সময়ই সহজ ও সরল ভাষায় বিষয় বস্তু উপস্থিত করা হ'য়েছে। উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্য সব সময়ই দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনার সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের বিষয় বস্তু বুঝতে খুবই সুবিধা হবে।

এ ছাড়া সব জায়গায়ই ব্যবহারিক পরিভাষা ব্যবহার করা হ'য়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আমরা নিজেদের পরিভাষা ব্যবহার করেছি। তবে প্রত্যেক জায়গায়ই বাংলার পাশে তার ইংরেজী প্রতিশব্দ লিখে দেওয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী প্রামাণ্য বই থেকে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। এরও অনুবাদ সংগে দেওয়া আছে। সাধারণতঃ কোন সংজ্ঞা বা কোন বিশেষ কথার তাৎপর্য বোঝানোর জন্য এরূপ করা হ'য়েছে। পরীক্ষামূলক বিষয়বস্তু খুব যত্ন সহকারে উপস্থিত করা হ'য়েছে। দরকার মত জায়গায় যন্ত্রপাতির ছবিও দেওয়া হ'য়েছে। মনে রাখার সুবিধার জন্য প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তালিকার সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থিত করা হ'য়েছে। এই সব তালিকাগুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে কাজ করবে।

লেখার সময় সব ক্ষেত্রেই পাঠ্যসূচীকে মেনে চলা হ'য়েছে। তবে কোন কোন জায়গায় আলোচনার যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য কিছু নতুন জিনিসের অবতারণা করা হ'য়েছে। যেমন বইয়ের প্রথমে সূচনার মধ্যে শরীর ও মনের

সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে। কিন্তু পাঠ্যসূচী হ'য়েছে স্নায়ুতন্ত্র সুরু দিয়ে। এখন কোন মনোবিজ্ঞানের ছাত্র বা ছাত্রী হঠাৎ শিক্ষককে যদি জিজ্ঞেস করে "মনোবিজ্ঞান পড়তে এসে স্নায়ুতন্ত্র পড়বো কেন?" এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হ'য়েছে। বিষয় বস্তুকে যেমন অযথা বাড়ানোও হয়নি তেমনি সংক্ষিপ্ত করাও হয় নি। অন্যান্য সমপর্যায়ের ঐচ্ছিক বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের যে পরিমাণ পড়তে [illegible] সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিষয়বস্তুর পরিমাণ ঠিক করা হ'য়েছে।

কতকগুলি ইংরাজী ভাষার বই ও [illegible] লেখক লেখিকাদের লেখা ইংরাজী ও বাংলা অনেক বই আমাদের এই লেখা[illegible] সাহায্য ক'রেছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ও আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ [illegible]পাধ্যায় ও ডাঃ রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং লেক বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীশতদল রায় ও ভূগোলের শিক্ষিকা শ্রীঅঞ্জলী রায় আমাদের অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী।

লেক বালিকা শিক্ষালয়ের কারুকলা বিভাগের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমণিকা বন্দোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বইয়ের আভ্যন্তরিক ছবি আঁকায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে বইয়ের বহিঅংগকে সুসজ্জিত ক'রেছেন। তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি ছাপার যোগ্য করে লেখার ব্যাপারে শ্রীতপেন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণপ্রকাশ ভট্টাচার্য, শ্রীবাণী ভক্ত, শ্রীবাসুদেব সান্যালিয়া প্রভৃতি বন্ধুরা অনেক সাহায্য করেছেন। তাদের সবাইয়ের কাছে আমরা ঋণী। আর দু'জনের কথা না বললে প্রায় সব কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁরা হ'লেন "এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি"র মৃণালবাবু ও সত্যসাধনা ছাপাখানার নিতাইবাবু। তাঁরা এই বই প্রকাশের দায়ীত্ব নিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

অনেক চেষ্টা সত্বেও বইয়ে যে সব ভুল ত্রুটি থেকে গেল তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখকদের।

সব শেষে সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কাছে অনুরোধ; এই বইয়ের রকম উন্নতির জন্য উপদেশ দিতে তাঁরা যেন কৃপণতা না করেন।

শ্রীতুশীন্দু রায়
শ্রীঅঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

দ্বিতীয় খণ্ড

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

খণ্ড

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

সূচনা

শরীর ও মনের মধ্যে সম্পর্ক
[The relation between ybod & mind

আমরা সাধারণ ভাবেই দেখতে পাই মন আর শরীরের মধ্যে একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে। আমরা বলি "ভাই শরীরটা বড় খারাপ, পড়ায় মন বস্‌ছে না।" আবার হঠাৎ কোন মানসিক আঘাত পেলে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। যেমন—লক্ষ্য করে থাকবে কেউ কেউ কোন দুঃখের সংবাদ পেয়েই হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে যায়। এইসব সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, অনেক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার (Mental process) সংগে একটা করে বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। অর্থাৎ যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা (Physical event) যা শরীরের উপর ক্রিয়া করে তা মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তা'হলে আমরা বল্‌তে পারি মানসিক অবস্থা আর শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সহগতি (Correlation) আছে। এই সহগতিকে বলা হয় শরীর-মনের সমান্তরতা (Psycho-physical parallalism)।

শরীর আর মনের মধ্যে এই যে সহগতি, বা, শারীরিক অবস্থা আর মানসিক অবস্থার মধ্যে যে সমান্তর সম্পর্ক, এটাই হ'ল মনোবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এই ধারণা বহুদিন থেকে দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে চলে আসছে, যার ফলে তারা শরীর-মনের সমান্তরতার সূত্র (Law of Psycho Physical-parallalism) আবিষ্কার করেছেন। এই সূত্রকে এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে এই দাঁড়ায় যে—প্রত্যেক মানসিক অবস্থার সংঙ্গে একটা যোগ্য বা অনুরূপ (Corresponding) শারীরিক অবস্থা আছে। যেমন—ভয় পেলে আমাদের বুক ধড় পড় করে বা হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বেড়ে যায়। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে এর উল্টো কোন সময়ে হয় না।

অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক অবস্থার সংগে বিশেষ বা নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থা নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ বুক ধড় পড় করলেই আমরা যে ভয়ই পাবো এমন কোন কথা নেই, রাগও করতে পারি। অনুরূপ বা সদৃশ ব'ল্তে যা বোঝায় এ ক্ষেত্রে মানসিক আর শারীরিক অবস্থার মধ্যে সে সম্পর্ক থাকে না। তবে দুটি ক্রিয়া পাশাপাশি থাকে—তারা সংগ। একটা ঘটলে আর একটা ঘটে। তাদের মধ্যে যে ধরনের মিল আছে তার স্বরূপ জানতে হ'লে নীচের এই কয়েকটা জিনিস মনে রাখবো।

[1] শরীর আর মনের মধ্যে এই মিল আছে ব'লে তাদের আমরা অনন্য (Identical) ব'ল্তে পারি না। মন অপার্থিব বস্তু—তাই মানসিক অবস্থার কোন বিস্তৃতি নেই। অর্থাৎ মন খারাপ ব'ল্লে, কোন জায়গাটা কতখানি খারাপ তা বুঝি না। কিন্তু শরীরের একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাই এর যে কোন পরিবর্তনের নির্দিষ্ট বিস্তৃতি আছে। সুতরাং এই দিক থেকে তাদের মধ্যে একত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

[2] যদিও তারা অনন্য নয় তবুও তাদের মধ্যে অন্যান্য দিক থেকে মিল আছে। যেমন—পর্যায়ক্রমে অবস্থার পরিবর্তনের সংগে এই দুই প্রক্রিয়ার মিল আছে। যখন আমরা কিছু চিন্তা করি বা যখন আমরা আবেগের বশবর্তী হই, তখন আমাদের স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়, রক্তের চাপের পরিবর্তন হয়, ইত্যাদি।

[3] জটিলতা বৃদ্ধির দিক থেকেও এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। যতই আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া জটিল হ'তে থাকে ততই আমাদের মস্তিষ্কে (Brain) রক্ত সঞ্চালন বেশী হ'তে থাকে।

[4] সুস্থতা আর অসুস্থতার দিক থেকেও বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে মিল আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় আমাদের শরীর ভাল থাক্লে মনও হাসিখুশি থাকে, আবার অসুখ করলে মনও খারাপ থাকে।

[5] আর একটা দিক থেকে এদের মধ্যে মিল আছে, সেটা হ'ল যে শরীরের বিভিন্ন অংশগুলো বা শরীরের বৈশিষ্ট্য আমরা জন্মগত ভাবে পাই, সেইরূপ মানসিক গুণও আমরা জন্মগত ভাবে পাই।

সুতরাং উপরের এই আলোচনা থেকে ব'ল্তে পারি মন আর শরীরের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। আমাদের যে কোন রকম মানসিক অভিজ্ঞতার জন্য শারীরিক মাধ্যম প্রয়োজন। তাই মানুষের আচরণ সম্বন্ধে জানতে হ'লে এই দু' রকমের প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই জানার প্রয়োজন। যে শারীরিক মাধ্যমে আমাদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তা হ'ল স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)। অতএব

-সূচনা

প্রথমে আমরা শরীরের সেই বিশেষ অংশের কথা আলোচনা করবো যা আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

QUESTIONS

1. State the law of psycho-physical parallalism. Why it is necessary to study the nervous processes in the psychology ?

2. "Mind and body are homologous Systems"—explain.

3. Explain the nature of correspondence that exists between mental and physical processes.

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

স্নায়ুতন্ত্র

[Nervous System]

পথে সাপ দেখ্‌লে আমরা দূরে সরে যাই, কোন পরিচিত বন্ধুকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখ্‌লে আমরা ডাকি; এরোপ্লেনের শব্দ শুনলে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি; কোন খাদ্য দ্রব্য সামনে ধর্‌লে আমাদের মুখে জল আসে; রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে কোন ভালো গন্ধ পেলে আমরা উৎস খুঁজে বেড়াই। এই যে কাজগুলো করি, এই সব কিছুর মূল হ'চ্ছে স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্রই হ'লো আমাদের সব অনুভূতির মূল। কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে (Retina) পড়্‌লেই আমরা দেখ্‌তে পাই না। দৃষ্টির অনুভূতি হয় চক্ষু স্নায়ুর (Optic-nerve) দ্বারা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর কাজ হ'ল বাইরের জগৎ থেকে উত্তেজনা গ্রহণ করা। কিন্তু শুধুমাত্র উত্তেজনা হ'লে তো চলবে না, উত্তেজনা অনুযায়ী কাজও করতে হবে। এই উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার কাজ ইন্দ্রিয়ের নয়। এই কাজ করে স্নায়ুতন্ত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সব অনুভূতি জন্মে আসলে তার মূলে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্র শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থেকে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের শরীরের সব জায়গাতেই সূক্ষ্ম সুতোর মত এক রকম পদার্থ আছে একে বলা হয় স্নায়ু (Nerve)। মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্ক (Brain) সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord) এবং এর থেকে যে সব শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে তাদের সবগুলোকে এক কথায় বলা হয় স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)। কার্যকারীতা আর জৈবিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা স্নায়ুতন্ত্রকে (Nervous system) প্রধান তিনটা অংশে ভাগ করতে পারি। তবে এই অংশের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। শুধুমাত্র আমাদের সুবিধার জন্যই আমরা এই সমস্ত সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন তন্ত্রের কিছুটা ক'রে অংশ নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করবো। এই অংশগুলো হ'ল—A. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system), B. উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র (Peripherial Nervous system) আর C. স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous system)।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system)

আগেই ব'লেছি স্নায়ুতন্ত্র ব'ল্‌তে আমরা মস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ড এবং তাদের থেকে উদ্ভূত শাখা প্রশাখাকে বুঝি। এখানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ব'ল্‌তে আমরা শুধুমাত্র মস্তিষ্ক (Brain) আর সুষুম্নাকাণ্ডকেই বুঝি। অর্থাৎ এখানে আমরা তাদের কোন শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বো না। সুতরাং শুধুমাত্র মস্তিষ্ক (Brain) আর সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ গঠিত তাকেই বল্‌ছি—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system)। শুধুমাত্র মস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে গঠিত বলে এর আর এক নাম হ'ল (Cerebro-Spinal axis)। এখন আমরা এই স্নায়ুতন্ত্রের দু'টো প্রধান অংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে আলোচনা কর্‌বো।

1. মস্তিষ্ক [Brain]

স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হ'ল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হ'ল বিচার, বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র। এক কথায় মস্তিষ্ক হ'ল সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড। বিশেষ বিশেষ কার্য ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা মস্তিষ্ককে চারটা অংশে ভাগ কর্‌তে পারি। a. গুরুমস্তিষ্ক (Cereb-

মস্তিষ্ক [The brain]
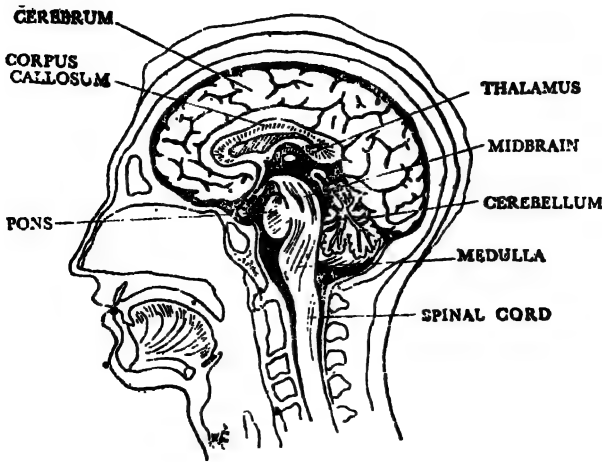
rum), b. লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum), c. মধ্যমস্তিষ্ক (Mid Brain) আর d. সুষুম্নাশীর্ষ (Medulla Oblongata)।

[a] **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum) : মাথার উপরে সামনের দিকের বৃহত্তর

অংশের নাম গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের প্রায় ৯/১০ অংশ। এর ওপরটা ধূসর রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) দিয়ে তৈরী। এর ওপরে অনেক ভাঁজ আছে এবং ঐখানে অসংখ্য স্নায়ু ও ধমনী আছে। যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের ধূসর অংশের উপর ভাঁজ তত বেশী। এই ধূসর অংশকে বলা হয় কর্টেক্স (Cortex)। এর নীচের বা ভেতরের অংশ একেবারে সাদা, এই অংশটা স্নায়ুকোষ থেকে উদ্ভূত শাখার সমষ্টি। গুরু মস্তিষ্ক দু'টো অংশে বিভক্ত—বাম আর ডান। মাঝখানে গভীর একটা খাদ আছে। এই দু'টো অংশ যে স্নায়ুরজ্জু দিয়ে জোড়া আছে তাকে বলা হয় কর্পাস্ ক্যালোসাম্ (Corpus Callosum)। এর প্রত্যেক অংশে আবার কতকগুলো ছোট ছোট নালী আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে দুটো বড় তাদের নাম হ'ল—রোলেণ্ডো (Rolando) আর সিলভিয়াস্ (Sylvius)। এই দু'টো নালী গুরুমস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশকে চারটে অংশে ভাগ করেছে। এই এক একটা অংশকে বলা হয়, পিণ্ড বা (Lobe)। এই চারটে পিণ্ড (Lobe) হ'ল—সম্মুখ (Frontal lobe), মধ্য (Parietal lobe), পশ্চাৎ (Occipital lobe) আর নিম্ন (Temporal lobe)। গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুই অংশের বিশেষ বিশেষ স্থান আমাদের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়ের কাজ চালনা করে। দর্শন (Vision), শ্রবণ (Hearing), গন্ধ (smell), স্বাদ (Test) প্রভৃতি কাজের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে উভয় দিকেই বিশেষ বিশেষ জায়গা আছে। এই স্থানবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে আলাদা ভাবেই করবো। কারণ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে জানার পরই এটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে আমাদের দেহের ডান অংগগুলো সব গুরুমস্তিষ্কের বাম ভাগের অধীন আর বাম অংগগুলো ডানভাগের অধীন। আবার বাক্‌শক্তির কেন্দ্র মাত্র একটা এবং সেটা বামভাগেই থাকে।

কোন বস্তু চোখের সামনে এলে তার ছবি গিয়ে অক্ষিপটে (Retina) পড়ে এবং তখন চক্ষুস্নায়ুর ক্রিয়ার ফলে একটা উত্তেজনা গিয়ে আমাদের গুরুমস্তিষ্কের যে অংশটা দৃষ্টি শক্তির অনুভূতি দেয় সেখানে কাজ করে। ফলে আমরা বস্তুটা দেখতে পাই। আবার কানের পর্দায় শব্দতরঙ্গ এসে পৌছালে ঐ পর্দা কাঁপতে থাকে তখন ঐ উত্তেজনা বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলী (Auditory Nerve) দ্বারা গুরুমস্তিষ্কে যায় তবেই আমরা শুনতে পাই। সারা জীবন ধরে যা শিখি তার স্মৃতিও আমাদের গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশে থাকে। কোন কারণে সেই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে আমরা স্মৃতিভ্রষ্ট হই। আবার গুরুমস্তিষ্কের ডান দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে বাম

অংশগুলো অকেজো হ'য়ে যায় আর বাম দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ডান অংগগুলো অকেজো হ'য়ে যায়। একেই বলা হয় পক্ষাঘাত।

[b] **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum) : লঘুমস্তিষ্ক থাকে গুরুমস্তিষ্কের পেছনে এবং নীচে। এরও দুটো অংশ আছে। সাদা স্নায়ুকলাকে (Nerve tissue) আবৃত করে ধূসর রঙের স্নায়ুকোষ (Nerve cell) আছে। গুরুমস্তিষ্কের দুটো অংশ যেমন একটা স্নায়ুরজ্জু দ্বারা জোড়া থাকে ঠিক তেমনি লঘুমস্তিষ্কের দু'টো অংশও একটা মোটা স্নায়ুতন্তুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই স্নায়ুতন্তুকে বলা হয় পনস্ ভেরোলি (Pons varolli)।

[c] **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid Brain, Basal ganglion, Interbrain) : এটা গুরুমস্তিষ্ক আর লঘুমস্তিষ্কের মাঝখানে আছে এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। এর সামনের দিকে একটা প্রধান কেন্দ্র হ'ল থ্যালেমাস (Thalamus) আর তার ঠিক নীচে আছে হাইপোথ্যালেমাস (Hypothalamus)।

[d] **সুষুম্নাশীর্ষ** (Medulla Oblongata) : মস্তিষ্কের একেবারে পেছনের দিকে সুষুম্নাশীর্ষ থাকে। প্রকৃত পক্ষে এটা সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) উপরের দিক্কার স্ফীত অংশ। মস্তিষ্কের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের যোগ স্থাপন করাই হ'ল এর কাজ। এটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। এই সুষুম্নাশীর্ষকেই আমাদের গুরু মস্তিষ্কের দুটো অংশ থেকে আগত স্নায়ু রজ্জুগুলো পরস্পরকে ছেদ করে শরীরের বিপরীত দিকে চলে যায়।

2. **সুষুম্নাকাণ্ড** [Spinal cord]

যে স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের মাঝখানে সুষুম্নাপথে নেমে আসে তাকে বলা হয় সুষুম্নাকাণ্ড। কেবল মাত্র করোটিকা S nl) ছাড়া শরীরের আর সমস্ত অংশের স্নায়ুগুলো সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সুষুম্নাশীর্ষ থেকে হাড় পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় 18 ইঞ্চি। এটা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু। এই সুষুম্নাকাণ্ড থেকে 31 জোড়া স্নায়ু নারকেল বা খেজুর পাতার মত দুদিকে ছড়িয়ে আছে।

[B] **উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র** (Perephenial Nervous System) : যে সব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুগুলো আমাদের শরীরের বহিঃঅংগগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশের সংযোগ স্থাপন করছে তাদের বলা হয় উপান্ত স্নায়ু (Perepherial nerve)। এই সব উপান্ত স্নায়ুগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র (Perepherial nervous system)। উৎপত্তি স্থান অনুযায়ী এই স্নায়ুগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ ক'রতে পারি। 1. যে সব স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ক

থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি মাথার খুলির মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে যায় তাদের বলা হয় করোটি স্নায়ু (Cranial Nerves)। ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা ও কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই করোটি স্নায়ুগুলোর আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। নীচে এই রকম কয়েকটি করোটি স্নায়ু আর তাদের কাজের তালিকা দেওয়া হ'ল। এছাড়া আরো অনেক রকমের করোটি স্নায়ু আছে।

করোটি স্নায়ু Cranial nerves	কাজ Functions
1. গন্ধ স্নায়ু (Olfactory Nerve)	1. গন্ধ (Smel)
2. চক্ষু স্নায়ু (Optic Nerve)	2. দর্শন (Vision)
3. শ্রবণ স্নায়ু (Auditory Nerve)	3. শ্রবণ (Hearing)
4. স্বাদের স্নায়ু (Gustatory Nerve)	4. স্বাদ (test)
[i] Facial nerve	[i] জিহ্বার সামনের ⅔ অংশের স্বাদ
[ii] Glosopheryngeal nerve	[ii] জিহ্বার পেছনের ⅓ অংশের স্বাদ

তাদের বিষয়ে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এই উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের অপর অংশের নাম 2. সুষুম্না স্নায়ু (Spinal nerve)। এগুলো সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়েছে, এই স্নায়ুগুলো হাত, পা, চামড়া, প্রভৃতিতে যায়। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে 31 জোড়া স্নায়ুতন্তু বেরিয়েছে সেগুলোও এই সুষুম্নাস্নায়ুর ভেতর পড়ে। এদের আর এক নাম হ'ল দৈহিক স্নায়ু (Somatic nerve)।

[C] **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র** (Autonomic Nervous System) : কেন্দ্রীয় ও উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে কতকগুলো স্নায়ু গ্রন্থি (Ganglia) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংগে পরস্পর যুক্ত থেকে একটা স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র গড়েছে (Autonomic Nervous system)। এই স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের আদেশাধীন নয়। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী এরা স্বাধীনভাবে এদের কাজ চালিয়ে যায়। অর্থাৎ এদের কাজ সম্বন্ধে আমরা সব সময়ে সচেতন নই। পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্রের স্নায়ুগুলো এর ভেতর পড়ে।

উপান্ত স্নায়ুর সংগে এদের তফাৎ হ'ল এই যে এই স্নায়ুগুলো অন্তরংগে ছড়িয়ে থাকে আর উপান্ত স্নায়ুগুলো বহিরংগের সংগে যুক্ত। একটা কথা মনে রাখার

দরকার উপান্ত এবং স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র এদের উভয়েরই উৎপত্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন না কোন অংশ থেকে, অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে। উৎপত্তির স্থান অনুযায়ী এই স্নায়ুতন্ত্রকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি।

[i] **উর্দ্ধবিভাগ** (Upper division) : যেগুলো সুষুম্নাশীর্ষ আর মধ্য মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে।

[ii] **মধ্য বিভাগ** (Middle division) : এগুলো বেরিয়েছে সুষুম্নাকাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গা থেকে।

[iii] **নিম্ন বিভাগ** (Lower division) : এগুলো সুষুম্নাকাণ্ডের একেবারে নীচের দিক থেকে বেরিয়েছে

এদের মধ্যে মধ্যবিভাগটিকে বলা হয় সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic Nervous system) আর বাকী দু'টোকে এক সংগে বলা হয় পরা-সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র (Para Sympathetic Nervous system)।

স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান

[Elements of the Nervous System]

এতক্ষণ আমরা স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এবারে বল্‌বো স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানের কথা। অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র কি দিয়ে গঠিত ? আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু (Nerve) ছোট ছোট স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরী। এই স্নায়ুকোষের (Nerve cell বা Neurone) কথা তোমরা আগেই অনেক জায়গায় শুনেছ। যে বিশেষ কোষ দ্বারা আমাদের স্নায়ুগুলো তৈরী তাকে বলা হয় স্নায়ু-কোষ (Neurone)। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের শরীরে লক্ষ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ থাকে।

প্রত্যেক স্নায়ুকোষের দুটো অংশ আছে। একটা হ'ল—প্রত্যেক প্রাণীকোষে যা থাকে (i) কোষের মূল অংশ বা নিউক্লিয়াস (Cell body বা Neucleus)। আর একটা হ'ল (ii) এই স্নায়ুকোষের মূল অংশের দেওয়াল থেকে চার পাশে সাদা রঙের কতকগুলো তন্তু বেরিয়ে থাকে। এই তন্তুগুলো আবার দুই ধরনের হয়। a. এ্যাক্‌সন (Axon) আর b. ডেনড্রাইট্‌স্ (Dendriteis)। সাধারণতঃ একটা স্নায়ুকোষে একটা এ্যাক্‌সন আর কতকগুলো ডেনড্রাইট্‌স্ থাকে। ঐ সাদা তন্তুগুলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড় তাকেই বলা হয় এ্যাকসন। এটা অনেক সময় পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। একটা পরিপুষ্ট এ্যাকসনকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এর তিনটে অংশ আছে। একেবারে

ভেতরে একটা নরম জৈবিক অংশ আছে। একে বলা হয় Axis cylinder। এই Axis cylinder কে আবৃত করে পর পর দুটো সাদা নালী আছে। একেবারে বাইরের ঢাক্‌নাটাকে বলা হয় Primitive Sheath আর ভেতরেরটাকে বলা হয় Medullary sheath। এই এ্যাকসনের চেয়ে ছোট ছোট যে তন্তুগুলো তাদের বলা হয় ডেনড্রা-ইটস্! সাধারণতঃ স্নায়ু-কোষের এ্যাকসনটাকেই বলা হয় তন্তু (Fibre) আর এরকম কতকগুলো মিলেই হয় স্নায়ু (Nerve)। যেখানে কতকগুলো কোষ (Cell body) মিলিত হয় তাকে বলে স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglion)।
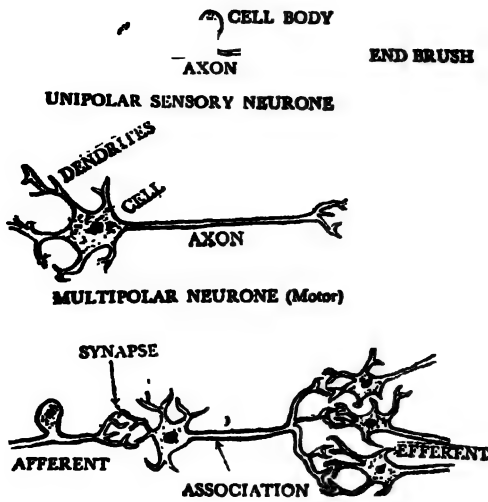
স্নায়ুকোষ (Synapse)

[উপরে বহুমুখী স্নায়ুকোষ বা চালক স্নায়ুকোষ মধ্যে একমুখী স্নায়ুকোষ বা সংবেদক স্নায়ুকোষ নীচে সংযোজক স্নায়ুকোষ।]

এখন যদিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটা করে এ্যাকস্‌ন আর কতকগুলো ডেনড্রাইটস্ থাকে তবুও অনেক সময়ে এর ব্যতিক্রম হয়। অর্থাৎ এই গঠনের তারতম্য দেখা যায়। আর এই রূপাং অনুযায়ী আমরা স্নায়ুকোষকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। (i) বহুমেরু স্নায়ুকোষ (Multipolar neurone)—এই সব স্নায়ুকোষে একটা করে এ্যাকস্‌ন আর কতকগুলো করে ডেনড্রাইটস্ থাকে। অনেক গুলো করে শাখা প্রশাখা থাকে বলে এদের বহুমেরু স্নায়ুকোষ বলা হয়। (ii) একমেরু স্নায়ুকোষ (Unipolar neurone)—এই সব স্নায়ুকোষে বহু শাখা প্রশাখা নেই, শুধু একটা মাত্র এ্যাকসন্ কোষ (cell body) থেকে একটু দূরে গিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এই স্নায়ুকোষের এ্যাকসন্ বা ডেনড্রাইটস্ এর শেষ প্রান্তগুলো আবার ঘাসের ডগার মত ভাগ হ'য়ে বেরিয়ে থাকে। একে বলা হয় End brush বা শেষ

প্রান্ত। এই সব স্নায়ুকোষগুলো এক সংগে জুড়ে থেকে স্নায়ু গঠিত হয়। একটা স্নায়ুকোষের সংগে আর একটা স্নায়ুকোষ জুড়ে থাকে। এই জোড়া লাগার একটা নিয়ম আছে। একটা স্নায়ুকোষের এ্যাকসনের শেষ প্রান্ত আর একটা স্নায়ুকোষের একটা ডেনড্রাইটস-এর শেষ প্রান্ত প্রায় স্পর্শ করে থাকে। এই সন্ধিস্থলকে বলা হয় স্নায়ুসন্ধি (Synapse)।

এ পর্যন্ত বলে আমরা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করবো। এখন আলোচনা করবো স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের কাজ সম্বন্ধে। এক এক করে বলবো বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর স্নায়ুতন্ত্রের প্রকার সম্বন্ধে। তবে এই কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমরা এর উপাদানের অর্থাৎ বিভিন্ন স্নায়ুকোষের কাজ সম্বন্ধে বলবো। পরে বিভিন্ন অংশের কাজের কথা আলাদা আলাদা করে বলবো।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ
[Function of the Nervous System]

[a] **স্নায়ুকোষের কাজ** (Function of the neurone) : সাধারণভাবে স্নায়ুকোষের কাজ হ'ল দুরকম—একটা হ'ল উত্তেজিত হওয়া (Irritability) আর একটা হ'ল পরিবহন করা (Conductivity)। অর্থাৎ সামান্যতম উত্তেজক-বস্তুর উপস্থিতিতে এই সব স্নায়ুকোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং সংগে সংগে শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পৌঁছে দেয়।

এই দুটো সাধারণ কাজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকোষ কতকগুলো বিশেষ ধরনের কাজ করে। যেমন—(1) কতকগুলো আছে যারা স্নায়বিক উত্তেজনাকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় থেকে সুষুম্নাকাণ্ডে বা মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। এদের বলা হয় অন্তর্মুখী স্নায়ুকোষ (Afferent neurone) বা সংজ্ঞা স্নায়ুকোষ (Sensory neurone)। সাধারণতঃ এগুলো একমেরু (Unipolar) স্নায়ুকোষের মধ্যে দেখা যায়। এই সব স্নায়ুকোষের কোষ (Cell body) বাইরে থাকে কিন্তু এ্যাকসনের একটা দিক ইন্দ্রিয়ের সংগে আর একটা দিক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশের সংগে জুড়ে থাকে। (ii) আর এক রকম স্নায়ুকোষ আছে, বিশেষ করে বহুমেরু স্নায়ুকোষ—এর কাজ হ'ল স্নায়বিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইন্দ্রিয়ে বহে আনা। শরীরের অংগ প্রত্যংগকে কার্যকরী করা। এগুলো ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসে বলে এদের বলা হয় বহির্মুখী স্নায়ুকোষ (Efferent neurone) বা চালক স্নায়ুকোষ (Motor neurone)। (iii) এ দুরকম স্নায়ুকোষ ছাড়াও

আর এক ধরনের স্নায়ুকোষ আছে তারাই বিশেষ ধরনের কাজ করে। এরা বহুমেরু, আর এদের কাজ হ'ল ওপরের ঐ দু রকম স্নায়ুকোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

যে কোন রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা একবার সংজ্ঞা স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করলে তাকে চালক স্নায়ুকোষের মাধ্যমে ফিরে আসতে হবে।

এছাড়া স্নায়ুগ্রন্থির কাজ হ'ল স্নায়বিক শক্তিকে বাধা দেওয়া। যদিও স্নায়ুকোষ গুলো স্নায়ুগ্রন্থির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জুড়ে আছে তবুও বিভিন্ন ভাবে এটা স্নায়বিক শক্তি (Nerve current) পরিবহনে বাধা দেয়। এই বাধা বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন নিয়ম অনুসারে হয়। সে সম্বন্ধে বিশেষ তোমাদের জানার দরকার নেই।

(b) বিভিন্ন অংশের কাজ (Function of the Parts)

উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Function of the perepherial system): নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনা আগে হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আমরা প্রথমে উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনা করছি তার কারণ আসলে এই উপান্ত স্নায়ুই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আর বাইরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। স্নায়ুকোষ যেমন—সংজ্ঞা আর চালক আছে, এখানে স্নায়ুও ঠিক দু রকম আছে। সংজ্ঞা স্নায়ু (Sensory nerve), বা এর আর এক নাম হ'ল অন্তর্মুখী স্নায়ু (Afferent nerve)। এই সব স্নায়ুগুলো সংজ্ঞা স্নায়ুকোষের এ্যাকসন (Axon) দিয়ে তৈরী এবং এদের কাজ হ'ল বাইরে থেকে বা ইন্দ্রিয় থেকে খবর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশে পৌছে দেওয়া। আর এক রকম স্নায়ু আছে তাদের বলা হয় চালক বা বহির্মুখী স্নায়ু (Motor বা Efferent nerve)। এদের কাজ হ'ল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশ থেকে অংগ প্রত্যংগে খবর নিয়ে যাওয়া। এগুলো চালক স্নায়ুকোষের এ্যাকসন দিয়ে তৈরী। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে 31 জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে এদের মধ্যে দুরকম স্নায়ুই আছে। বহির্মুখী (Efferent nerve) স্নায়ুগুলো সুষুম্নাকাণ্ড থেকে পেটের দিকে এসে বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের পরিচালন পেশীতে চলে যায়। আর অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলো (Afferent nerve) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে এসে পিঠের দিক দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সংগে যুক্ত হয়। একটা উদাহরণ দিলে বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী স্নায়ুর কাজ সহজে বুঝতে পারবে।

ধর তোমার পায়ে মশা কামড়াচ্ছে এর অনুভূতি অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে তোমার মস্তিষ্কে পৌছালো। তখন মস্তিষ্ক চোখকে আদেশ করলো দেখার জন্য। এই আদেশ এল বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে। চোখে মশার দরুণ যে উত্তেজনা সেটা তোমার

মস্তিষ্কে যখন গেল অমনি তুমি বুঝ্‌লে মশা। এখন তোমার মস্তিষ্ক আবার চালক স্নায়ুর মাধ্যমে কর্মেন্দ্রিয়ে বা পেশীতে উত্তেজনা পাঠালো। সংগে সংগে তোমার হাত উঠ্‌লো তাকে মারার জন্য। এই উদাহরণ থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছো উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলো নিজেরা কিছু করতে পারে না। তাদের কাজ হ'ল শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আদেশ মত চলা আর কোন রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের খবর তার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ [Function of the different parts of the Central Nervous System]

মনের সংগে মস্তিষ্কের সম্পর্ক [Relation between Mind & Brain] : মনের সংগে মস্তিষ্কের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। শরীরের অন্যান্য অংগের চেয়ে আমাদের মস্তিষ্কই (Brain) বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে যে যুক্তিগুলো আছে সেগুলো হ'ল :

[1] শরীরের বিভিন্ন অংশের স্নায়ুগুলো সব মস্তিষ্কে গিয়ে মিশেছে। এই যোগাযোগের যে কোন অংশ নষ্ট হ'য়ে গেলে সেই অংশের অধীন শরীরের অন্য অংশগুলোও অকেজো হয়ে যায়। একে বলে পক্ষাঘাত। এর থেকে বোঝা যায় কোন বাইরের উত্তেজনা থেকে জ্ঞান পেতে হলে সেই উত্তেজনাকে মস্তিষ্ক দিয়ে আস্‌তে হয়।

[2] দেখা গেছে, উত্তেজনা প্রয়োগ আর তার থেকে যে সংবেদন সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে একটা সময়ের পার্থক্য থাকে। এই যে সময়ের পার্থক্য এটাকে মনোবিদ্ ও শরীর বিজ্ঞানীরা স্নায়ুবাহী সময় বলেন। অর্থাৎ উত্তেজনার মস্তিষ্কে পৌঁছতে ঐ সময় লাগে।

[3] আমরা যখন খুব বেশী চিন্তা করি বা খুব বেশী আবেগের (Emotion) বশবর্তী হই, তখন আমাদের মস্তিষ্কের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এর থেকে বোঝা যায় আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সংগে মস্তিষ্কের একটা সম্বন্ধ আছে।

[4] আবার এরকমও দেখা গেছে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল ঠিকমত না হ'লে মানসিক বিকৃতি হয়। অর্থাৎ চিন্তা শক্তি বিকৃত হয়। আবার অনেক সময় রক্ত চলের অভাবে আমরা অচেতন হই।

[5] হঠাৎ মস্তিষ্কে কোন আঘাত লাগ্‌লে আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি। তখন আমাদের মানসিক ক্রিয়া (Mental activities) কিছুই থাকে না।

[6] আবার এও দেখা গেছে বেশী চিন্তা করলে আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন Fatigue) হ'য়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাথা ধরে।

[7] কতকগুলো মানসিক রোগ, যেমন—Aphasia (কতকগুলো শব্দ শোনা যায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না) মস্তিষ্কের আঘাতের সঙ্গে জড়িত।

[8] এও দেখা গেছে মানুষের বুদ্ধি মস্তিষ্কের ওজনের সংগে সমানুপাতী।

এই সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আস্‌তে পারি যে আমাদের মস্তিষ্কের সংগে মনের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। তাই মনোবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

[a] **গুরুমস্তিষ্কের কাজ : গুরু মস্তিষ্কের স্থান বিভাগের সূত্র** (The function of the Cerebrum : Theory of the localization of the functions in the Cerebrum) : গুরুমস্তিকের কাজ হ'ল বিভিন্ন উত্তেজনায় সচেতনভাবে সাড়া দেওয়া। এই গুরুমস্তিষ্কই হ'ল সমস্ত রকম উন্নত ধরনের মানসিক ক্রিয়ার উৎস। আগেই এ কথা বলা হয়েছে। এখন গুরুমস্তিষ্ক কিভাবে বিভিন্ন উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা আরও ব্যক্তিগত (Subjective) দিক থেকে বল্‌তে গেলে কি ভাবে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন উত্তেজনায় বিভিন্ন ভাবে সাড়া দিই সেই কথাই আলোচনা করবো। গুরুমস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা যখন সাধারণভাবে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছি এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং অংগের কাজ পরিচালনা
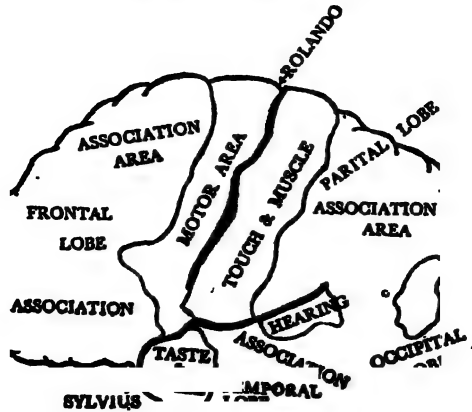
গুরুমস্তিষ্কে স্থান বিভাগ [Localization of functions in the cerebrum]

করে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্য আমাদের গুরুমস্তিষ্কে পৃথক পৃথক অংশ নির্দিষ্ট আছে। শ্রবণের জন্য আমাদের গুরুমস্তিষ্কের যে অংশ কাজ করে দর্শনের বা

স্বাদের জন্য সে অংশ করে না। এই যে আমাদের গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান আছে। একে বলা হয় (Localization)। কর্ম ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা সাধারণভাবে এই অংশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

[i] সংবেদন স্থান (Sensory region), [ii] কর্মস্থান (Motor region) [iii] সংযোগস্থান (The region of association)।

সংবেদন স্থানগুলো (Sensory region) গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো আছে। গুরুমস্তিষ্কের মধ্যার্দ্ধে (Parietal lobe) রোলাণ্ডো নালীর ঠিক ডানদিকে এবং উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (Post central gyrus) উপরের অংশে আছে স্পর্শ (Touch) ও পেশীবোধের (Muscular) কেন্দ্র। শ্রবণের কেন্দ্র (auditory region) আছে গুরুমস্তিষ্কের অংশ (Temporal lobe) সিলভিয়াসের নালীর (Fissure of sylvious) ডানদিকে। ঠিক এই প্রকোষ্ঠেই একেবারে নীচে আছে স্বাদ এবং গন্ধের কেন্দ্র (Region for taste & smell)। বাকি দৃষ্টি কেন্দ্র আছে পশ্চাত অংশের (Occipital lobe) নীচের দিকে।

কর্মস্থানগুলো (Motor regions) আমাদের গুরুমস্তিষ্কের একেবারে সম্মুখ অংশে অবস্থিত (Frontal lobe)। রোলাণ্ডার নালীর বামদিকে, প্রাক কেন্দ্রীয় আবর্তের (Pre central gyrus) এর মধ্যবর্তী অংশে মূল কর্মকেন্দ্র অবস্থিত। উপরের দিক থেকে নীচের বিভিন্ন অঙ্গের কেন্দ্রগুলো পর পর এই ভাবে সাজানো আছে —পায়ের আঙ্গুল (Toe), পা (Foot), হাঁটু (Knee), জঙ্ঘা (Hip), হাত ও মুখ। কথা বলবার কেন্দ্র (Speech centre) কর্মস্থানের একেবারে নীচের দিকে।

গুরুমস্তিষ্কের অনেকগুলো স্থান আছে যাকে সংবেদন স্থান অথবা কর্মস্থান কোনটির ভিতরে ফেলা যায় না। এই সবগুলোকে সংযোগস্থান (Association region) বলা হয়। এই সব কেন্দ্র সম্বন্ধে দেহবিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। তবে এদের সংযোগস্থান বলা হয় তার কারণ দেহবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই জায়গাগুলি আমাদের কর্মস্থান এবং সংবেদনস্থানের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার ফলে আমরা কোন উত্তেজনার (Stimulation) অর্থ খুঁজে পাই। এই সংযোগস্থান-গুলোকে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। প্রত্যেক সংবেদন স্থানের পাশেই যে সংযোগস্থান আছে, তারা আমাদের সংবেদনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে আমাদের কাছে (gives meaning to our sensations)। এই সব যায়গাগুলো নষ্ট হ'য়ে গেলে আমাদের সংবেদন থাকে কিন্তু তাদের বিশেষ বিশেষ যে অর্থ তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। এ্যাফোসিয়া (Aphesia) ব'লে একরকম অসুখ

হয় তাতে দেখা গেছে রুগীরা, কেউ যদি কথা বলে তার শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু কথা কিছু বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে তার গুরুমস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্র (Auditory region) ঠিকই আছে তবে ঐ শ্রবণকেন্দ্রের পাশে যে সংযোগ কেন্দ্রটি আছে তা নষ্ট হয়ে গেছে। যার জন্য সংবেদন ক্রিয়া বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেই শব্দের কোন অর্থ সে করতে পারছে না।

গুরুমস্তিষ্কে যে বিভিন্ন স্থান বিভাগ আছে তার প্রমাণ শরীর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেছেন। কোন প্রাণীর মাথার খুলির বিশেষ একটা বিন্দুতে ফুটো করে মস্তিষ্কের একটা স্থানে খুব দুর্বল তড়িৎশক্তি (Electric current) দিয়ে দেখা গেছে তাতে বিশেষ কোন অংগ কাজ করে। আবার কোন পক্ষাঘাতগ্রস্থ রুগীর মস্তিষ্ক অপারেসন করে দেখা গেছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশ কাজ করছে না। এই মস্তিষ্কের স্থান নির্ণয়ের বেশীর ভাগ কাজ করেছেন ডেনিস্ বৈজ্ঞানিক ল্যাস্লে (Lashley)।

লঘুমস্তিষ্কের কাজ [Function of the Cerebellum] : লঘুমস্তিষ্ক আমাদের শরীরের পেশীগুলোকে সঠিকভাবে চালনা করে। এটা আমাদের শরীরের ভারসাম্য (balance) ঠিক রাখে। হাটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া প্রভৃতির সময় যে ভারসাম্যের (balance) প্রয়োজন হয় লঘুমস্তিষ্ক সেই ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই লঘুমস্তিষ্ক নষ্ট হ'য়ে গেলে মানুষ দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না।

মধ্যমস্তিষ্কের কাজ (Function of the Mid Brain) : মধ্যমস্তিষ্কের কাজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এর মধ্য দিয়ে গুরুমস্তিষ্ক স্নায়ুবিক উত্তেজনার মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশের সংগে সংযোগ স্থাপন করে। তবে অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে অবস্থিত থ্যালেমাস (Thalamus) বা হাইপো থ্যালেমাস (Hypothalamus) সুষুম্নাশীর্ষ আর স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) মধ্য দিয়ে আমাদের আবেগের সময় যে সব আন্ত্রিক পরিবর্তন (Visceral change) হয়, সেগুলো ঘটায়।

সুষুম্নাশীর্ষের কাজ [Function of the Medulla Oblongata] : মস্তিষ্কের সংগে সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করাই হ'ল এর কাজ। তবে এর যদি কোন ক্ষতি হয় সমস্ত শরীরের সংগে মস্তিষ্কের যোগাযোগ বন্ধ হ'য়ে যায় ফলে যে কোন রকমের অঘটনই ঘটতে পারে। এটা আমাদের শরীরের শ্বাসতন্ত্র (Respira tory system) রক্ত সংবহন তন্ত্র (Circulatory system) ও পাচনতন্ত্র (Digestive system) কে নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ [Function of the Spinal Cord] : সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ হ'ল উপান্ত স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে আগত উত্তেজনাকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া। এছাড়াও সুষুম্নাকাণ্ডের নিজেরও কিছু কাজ চালনা করার ক্ষমতা আছে। প্রতিক্রিয়াজনিত কর্ম (Reflex action) গুলো সব এই সুষুম্না-কাণ্ডের পরিচালনাধীন। যেমন—হাত-পা নাড়া, ইত্যাদি। এছাড়াও অভ্যাস জনিত কিছু কর্মও (Habitual) সুষুম্নাকাণ্ড পরিচালনা করে। যেমন—হাঁটা, দৌড়ান ইত্যাদি। এই সব কাজগুলো সব স্বতশ্চল (automatic) হয়।

স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Function of the Autonomic Nervous system) : স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংগে সহযোগিতা রেখেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আমাদের দেহের স্বতশ্চল যে সব প্রক্রিয়া আছে (পাচন, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন) তাদের কার্য চালনা করে। এটা বিশেষ করে আমাদের আবেগ-ময় অবস্থায় কাজ করে। বিশেষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এখন প্রমাণ হ'য়েছে যে এই স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের তিনটে অংশ আলাদা আলাদা কাজ করে।

[1] ঊর্ধ্ব বিভাগ (Upper division) আমাদের পাচনতন্ত্রের কাজের সাহায্য করে। আবার হৃদ্‌ যন্ত্রের স্পন্দন কমিয়ে আমাদের অংগ প্রত্যংগের পেশীর কাজকে ব্যাহত করে।

[2] মধ্য বিভাগের (Middle division) কাজ কিন্তু ঠিক উল্টো। এটা আমাদের পাচন তন্ত্রের কাজকে ব্যাহত করে কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বাড়িয়ে আমাদের অংগ প্রত্যংগের পরিচালন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই বিভাগটিকে বলা হয় সহানুভূতিশীল বিভাগ। এই বিভাগ আমাদের আবেগময় অবস্থায় বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

[3] নিম্ন বিভাগ (Lower division) আমাদের জনন গ্রন্থিকে কার্যকারী রাখে।

একত্রে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ

[The Function of the Nervous system as a whole]

পূর্বেই আমরা আলাদা আলাদাভাবে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের আর বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং আবার তাদের কাজ সম্বন্ধে একত্রে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। তা'হলে আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের সংগে আমরা এইসব খণ্ড কাজগুলোকে যাতে গুলিয়ে না ফেলি তার জন্য একবার এই সব কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সংগে সংগে

সেই সব কাজে আমাদের কি ধরনের স্নায়বিক ক্রিয়া হয় তাও আলোচনা করবো।

আমরা বেঁচে আছি প্রকৃতির (Nature) সংগে লড়াই করে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। কোন শক্ত জিনিস চোখের সামনে এলে সংগে সংগে চোখ বন্ধ করে দিই, আবার বিপদে পড়লে ঠিক বিচার বিবেচনা করে কি করা উচিত তাই করি। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব সাধারণ অবিবেচনাপূর্ণ কাজ থেকে শুরু করে উচ্চতম মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন সব রকমের কাজই করি। এই সমস্ত কাজ করায় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। এ কথা আমরা আগেও বলেছি। এখন যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে সেহেতু সব সময় এগুলো উত্তেজনা গ্রহণ করছে। এই উত্তেজনা উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে গিয়ে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে কোন অংশ মস্তিষ্ক বা সুষুম্না-কাণ্ডের মধ্য দিয়ে আবার উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের চালক স্নায়ু দিয়ে কর্মেন্দ্রিয়ে বা পেশীতে ফিরে আসে। এর ফলেই আমাদের বিশেষ উত্তেজনা বা বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ উত্তেজনা সংগ্রাহক (Receptor) বা কোন ইন্দ্রিয় থেকে সুরু করে যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দ্রিয়ে (Effector) যায় সেই সমস্ত পথটাকে বলে চাপ (Arc বা Circuit)। উত্তেজনা যখন যে পথ দিয়ে ঘুরে কর্মেন্দ্রিয়ে আসবে সেই মত এই চাপ ছোট বড় হবে। আবার এই কাজের দৈর্ঘ্যের উপরই কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে। চাপের দৈর্ঘ্য হিসাবে আমরা কাজ বা ঐ চাপ-কেই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।
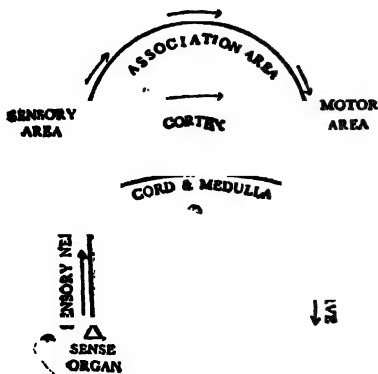
স্নায়বিক উত্তেজনার তিন প্রকার চাপ
[Three arcs of nerve current]
প্রথম ধাপ—অবচেতন তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার চাপ
[Unconscious Reflex arc]
দ্বিতীয় ধাপ—চেতন তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার চাপ
[Conscious Reflex-arc]
তৃতীয় ধাপ—বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজের চাপ
[Arc of Intelligent action]

[1] অবচেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ (Unconscious Reflex Arc): কেউ ঘুমিয়ে আছে, তুমি তার হাতে একটা গরম বা খুব ঠাণ্ডা জিনিস লাগাও, দেখবে সংগে সংগে সে না

জেগেই হাতটা সরিয়ে নিল। এ রকম অচেতন অবস্থায় আমরা'সকলে কিছু না কিছু কাজ করে থাকি। আর এই সব কাজ খুব তাড়াতাড়িই করি আর ভেবে চিন্তেও করি না। তাই এদের বলা হয় অবচেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Unconscious Reflex action)। এই সব কাজের সময় চাপ সবচেয়ে ছোট হয়। ইন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনা সংজ্ঞাস্নায়ু দিয়ে, সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে সুষুম্নাশীর্ষ পর্যন্ত গিয়ে চালক স্নায়ু দিয়ে পেশীতে ফিরে আসে। ছবিতে একেবারে নীচের চাপটা এই ধরনের কাজের চাপ। অতএব সোজা কথায় সুষুম্নাকাণ্ড ও সুষুম্নাশীর্ষ যে সব কাজগুলোর কর্তা তাকেই বলা হয় অবচেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action of Unconscious type)।

[2] **চেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ [Conscious Reflex arc]** : যখন নাকে সর্দি জমে তখন তার একটা বিশেষ অনুভূতি হয় এবং সংগে সংগে আমরা হাঁচি বা নাক পরিষ্কার করি। এ সব কাজ গুলোও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ভেতর পড়ে, কিন্তু এ গুলোর সম্বন্ধে আমরা একেবারে অচেতন নই অর্থাৎ এই সব প্রতিক্রিয়াগুলো আমরা বেশ বুঝতে পারি তবে তাদের পেছনে কোন বিচার বুদ্ধির দরকার হয় না। সুতরাং যেহেতু আমরা এই সব কাজ সম্বন্ধে সচেতন সেহেতু এদের উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্ক পর্যন্ত যায়। কিন্তু গুরু মস্তিষ্কের সংযোগ কেন্দ্র পর্যন্ত পৌছায় না। অর্থাৎ উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে গিয়ে গুরু-মস্তিষ্কে সংবেদন স্থান থেকে সোজাসুজি কেন্দ্রীয় স্নায়ু আর চালক স্নায়ু হ'য়ে পেশীতে (কর্মেন্দ্রিয়ে) ফিরে আসে। এই সব কাজের চাপকে বলা হয় চেতন-তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ। ছবিতে মাঝারি যে চাপটা সেটাই হ'ল এইরকম চাপের বৈশিষ্ট্য।

এই সব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া-জনিত চাপে তিন রকমের স্নায়ুকোষই, [সংজ্ঞা স্নায়ু কোষ (Sensory neurone), চালক স্নায়ু কোষ (Motor neurone) আর সংযোগ স্নায়ু কোষ (Association neurone)] কাজ করে, এগুলো কিভাবে কাজ করে উপরের ছবিতে দেখানো হল।

সচেতন তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার চাপ
[Conscious reflex arc]

[3] **বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজের চাপ [Arc involving higher mental activities]** : যখন আমরা বিচার বা বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ

করি তখন চাপটি আরও জটিল হয়। চেতন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখেছি যে উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু (Sensory nerve) দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে চালক স্নায়ু দিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কাজে ঐ চাপ একটু বড় হয় এবং একটা আংটা (Loop) তৈরী করে মস্তিষ্কের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। ছবিতে সব চেয়ে যে বড় চাপটি সেটি হল এই রকম ধরনের কাজের চাপ। এই চাপ সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য এই সব কাজের পেছনে বিচার বুদ্ধি বেশি পরিমাণে থাকে।

এই গেল সংক্ষেপে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কাজ। তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাজের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করছে স্নায়ুতন্ত্র। এছাড়া সংজ্ঞাস্নায়ু আর চালক স্নায়ু কি ভাবে আমাদের কাজ করছে তা উপান্ত স্নায়ুর কাজের আলোচনার সময় বলেছি। সুতরাং নূতন করে আর বলার প্রয়োজন নেই। আর স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের কাজ তো একেবারে স্বতন্ত্রই। এটা আমাদের শরীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে।

[এই স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল। এ দেখলে একেবারে সমস্ত কিছুই এক সংগে তোমাদের মনে পড়বে।]

QUESTIONS

1. Name the different parts of the Nervous System and explain their importance in regulating human behaviour.

2. Draw an outline of the human Brain and show on it the different lobes. [W. B. H. S. 1960]

3. Give a general idea of the Central Nervous System with the help of a diagram.

4. Give an account of the Cerebro-spinal axis and explain in brief the function of each parts.

5. Describe the different parts of the Brain. State the reasons for which it is regarded as the 'seat of mind.'

6. Name the different parts of the Brain and explain how it is related to Mind.

7. What is meant by "Cerebral localization"? Show with the help of a diagram the different regions in the Cerebrum and explain their functions.

8. "A man hears the sounds but cannot distinguish them." Explain the phenomena with special reference to the localization in the Brain area.

9. Describe a Neurone. What is a synapse and what is it's function? Give diagram of the reflex arc and indicate its parts.

10. What is a Neurone? How many types of Neurone are there in the human body? Describe their structures and function.

11. What do you mean by an Arc? Classify action according to the nature of the Arc. Explain the Reflex Arc with an example.

12 Write short notes on :—

(a) Efferent nerve; (b) Afferent nerve; (c) Thalamus (d) Neurone; (e) Pons Varolli; (f) Madulla oblongata; (g) Reflex arc; (h) Synapse; (i) Cerebellum; (j) Motor region; (k) Axon and dendrites; (l) Lobes; (m) Autonomic Nervous system; (n) Sympathetic branch.

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

সংবেদন

[Sensation]

বাইরের জগতের সংগে আমাদের মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপন হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। এই সংযোগ যদি না হ'ত তাহ'লে আমরা বর্হিজগত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারতাম না। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা জ্ঞানার্জনের পথ বলতে পারি। প্রত্যেক প্রাণীরই ইন্দ্রিয় বা সংগ্রাহক (Receptor)—(যে উত্তেজনা বর্হিজগত থেকে গ্রহণ করছে) আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলোর একটা বিশেষত্ব হ'ল এই যে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। যেমন আমাদের চোখ সাধারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ ভাবে আমরা যাদের ইন্দ্রিয় বা সংগ্রাহক বলি তারা সবশুদ্ধ আছে পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। এদের কাজ দেখে মনে হয়, যেন এরা কোন বন্ধ ঘরের জানালা, আমরা এদের মধ্যে দিয়েই বাইরের জগতকে দেখতে পাই। স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনার সময় বলেছি যে কোন জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে সেই উত্তেজনা সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে (Sensory nerve) আমাদের মস্তিষ্কে যায়। এই যে খবর বা উত্তেজনা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে যাচ্ছে একে বলে সংবেদন। একটা উদাহরণ দিলে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারবে। ধর একজন কেউ বসে বাঁশী বাজাচ্ছে তোমার কানের দ্বারা মস্তিকে সে খবর পৌছল—আবার চোখে দেখলে একটা মানুষ ও একটা বাঁশী। এই সবগুলো মিলে আর তোমার কিছু অতীত অভিজ্ঞতা মিলে তুমি বুঝতে পারলে যে একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। কিন্তু এই যে তোমার বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হ'ল এটাকে কিন্তু আমরা সংবেদন বলি না। একে বলি প্রত্যক্ষণ। সংবেদন বলবো ঐ আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো খবর গুলোকে এখানে যেমন কানের মধ্যে দিয়ে একটি উত্তেজনা গেল—মস্তিষ্কে আমাদের শব্দের অনুভূতি হল; চোখের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনা মস্তিকে গেলে আমরা দেখলুম ইত্যাদি। এই সব সংবেদনগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে এক সঙ্গে মিশে যে বস্তু সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিল

তাকেই আমরা বল্‌ছি প্রত্যক্ষণ। তাহ'লে সংবেদন বলতে আমরা সেই সব বিচ্ছিন্ন (Isolates) এবং নিরপেক্ষ অনুভূতিগুলোকে বলবো যেগুলো আমাদের সংজ্ঞা স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে একসঙ্গে মিশে কোন একটা বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিতে সাহায্য করে। এক কথায় সংবেদন বলতে আমরা কোন বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক বোধ হিসেবে বলতে পারি। এটা সবচেয়ে সরল মানসিক প্রক্রিয়া। সংবেদনের জন্য একটা বাইরের উত্তেজক সব সময় প্রয়োজন হয়। এই উত্তেজক যে কোন রকমই পার্থিব বস্তু হ'তে পারে। কিন্তু যে কোন জিনিসকে আমরা উত্তেজক বলবো না। যখনই যে জিনিস আমাদের কোন সংগ্রাহককে উত্তেজিত করবে তখনই তাকে বলবো উত্তেজক। অন্ধ লোকের চোখের উপর আলো পড়লেই তার চোখ কোন উত্তেজনা পাঠাতে পারে না অর্থাৎ সে নিশ্চয় দেখতে পাবে না। সুতরাং অন্ধ লোকের কাছে আলো উত্তেজক নয়। কোন জিনিসকে আমরা উত্তেজক বলবো এই কারণে যে এই জিনিসটি আমাদের স্নায়ুগুলোকে এবং শরীরের অন্যান্য অংগকে কার্যকরি করে বা স্নায়বিক কর্মের শক্তি যোগায়। এখানে আর একটা কথা বলতে পারি যে সংবেদক হ'লো একটা উত্তেজক সম্বন্ধে জ্ঞান। অর্থাৎ উত্তেজকটি কি ধরনের, কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দিতে পারে।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেক প্রাণীরই শরীরে কতকগুলি সংগ্রাহক (Receptor) আছে। তাদের কাজ হ'ল বাইরের জগতের উত্তেজনা গ্রহণ করা। আর যে সংজ্ঞা স্নায়ু এই সংগ্রাহকের সংগে জুড়ে আছে তার কাজ হ'ল আমাদের মস্তিকে স্নায়বিক শক্তি নিয়ে যাওয়া এবং এর ফলে আমাদের উত্তেজক সম্বন্ধে বা আরো বৃহত্তর অর্থে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। যে ভাবে এবং যে সব জিনিসের দ্বারা আমরা এই জ্ঞান লাভ করি এবং পার্থিব বিভিন্ন উত্তেজক-এর মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারি অর্থাৎ এককথায় উত্তেজক, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কাজ এই সব মিলে মনোবিজ্ঞানের এই অংশকে বলা হয় "সংবেদন মনোবিজ্ঞান" (Sensory Psychology)।

এই সংবেদনের মূল কথা হ'ল, এটা ঘটে প্রাকৃতিক ঘটনা (Physical events) এবং আমাদের মানসিক অবস্থা (Mental state)—পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়ার ফলে; যে কোন রকম শক্তি যেমন শব্দ, আলো, ইত্যাদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর পড়লে আমরা শুনতে পাই, দেখতে পাই। তাহ'লে এখানে আলো বা শব্দ যে কোন উত্তেজকই হ'ল প্রাকৃতিক ঘটন (Physical events)। কিন্তু

দেখা (Seeing), শোনা (Hearing), ইত্যাদি হ'ল মানসিক প্রক্রিয়া। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে এই সংবেদন একেবারে পুরোপুরি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত নয়। প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে মানসিক পরিবর্তনের এটা একটা ধাপ। এই প্রাকৃতিক ঘটন ও সংবেদনের মধ্যে সম্বন্ধ দেখতে বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখার উদ্ভব হয়েছে, এর নাম হ'ল Psycho-Physics। এর আবিষ্কর্তা হ'লেন পদার্থ-বিজ্ঞানী জি, টি, ফেক্‌নার (G. T. Fechner)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মন আর বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা। এর সব আলোচনা তোমরা যখন আরো বেশী পড়বে তখন জানতে পারবে। এখনকার মত সংবেদনের শ্রেণীভেদ আর প্রত্যেক প্রকার সংবেদন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানলেই চলবে।

সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ [Classification of Sensation] : সংগ্রাহকের (Receptor) দ্বারা আমরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি। এখন এই সংগ্রাহক দু'রকমের হতে পারে। অন্তর্সংগ্রাহক (Internal Receptor) ও বর্হিসংগ্রাহক (External Receptor)। এই সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুযায়ী আমরা সংবেদনকে দুভাগে ভাগ করতে পারি।

[1] যে সব উত্তেজনা আমাদের বর্হিসংগ্রাহক (External Receptor) অর্থাৎ আমাদের ৫টি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে এবং তার ফলে আমাদের যে সংবেদন হয়, সেগুলোকে বলা হয় বিশেষ সংবেদন (Special Sensation)। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে পাঁচ রকম জ্ঞান আহরণ করি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এদের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট আছে। তাহ'লে ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিশেষ সংবেদন পাঁচ রকমের হতে পারে।

[2] আবার কতকগুলি সংবেদন আছে যার জন্য আমাদের অন্তর্সংগ্রাহক দায়ী। যেমন পাকস্থলীর পেশী সংকুচিত হ'লে আমাদের বিশেষ এক রকমের সংবেদন হয় যার জন্য বলি ক্ষিদে পেয়েছে। এই রকম অনেক সংবেদন আছে যেমন তেষ্টা পাওয়া, বমি পাওয়া ইত্যাদি। শরীরের ভিতরকার হৃদযন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র ইত্যাদির ক্রিয়ার ফলে এই যে সব সংবেদনের উদ্রেক হয় এদের বলা হয় যান্ত্রিক সংবেদন (Organic Sensation)।

[3] সংগ্রাহকের বিভিন্নতা অনুযায়ী উপরিউক্ত দুরকম সংবেদন হয়। এছাড়া আমাদের আর এক রকমের সংবেদন হয়। এই সংবেদনগুলো হয় আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের (Effector) ক্রিয়ার ফলে। আমাদের দেহের পেশীগুলো নাড়াচাড়ার

সংবেদন (Sensation)
বিশেষ সংবেদন
(Special sensation)
[এর জন্য দায়ী
বহিঃ সংগ্রাহক বা ইন্দ্রিয়
(External receptor)]
যান্ত্রিক সংবেদন
(Organic Sensation)
এর জন্য দায়ী
অন্তর্সংগ্রাহক
(Internal receptor)
পেশীয় সংবেদন
(Kinaesthetic Sensation)
এর জন্য দায়ী
পেশীয় সঞ্চালন
(Movement of the Muscles)
দর্শন
(Vision)
এর জন্য দায়ী
চোখ—(Eye)
শ্রবণ
(Auditory Sensation)
এর জন্য দায়ী
কান—(Ear)
ত্বক্জাত সংবেদন
(Cutaneous Sensation)
এর জন্য দায়ী
ত্বক্—(Skin)
স্বাদজনিত সংবেদন
(Gustatory Sensation)
এর জন্য দায়ী
জিহ্বা—(Tongue)
গন্ধজাত সংবেদন
(Olfactory Sensation)
এর জন্য দায়ী
নাক—(Nose)
রাসায়নিক সংবেদন
(Chemical Sensation)

ফলে আমাদের এক রকমের সংবেদন হয়। এই প্রকার সংবেদনকে বলা হয় পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation)।

তাহ'লে মোটামুটি ভাবে দাঁড়ালো সংবেদন তিন রকম—[1] বিশেষ সংবেদন (Special Sensation), [2] যান্ত্রিক সংবেদন (Organic Sensation), [3] পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation)। শেষের দুরকম সংবেদন সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই। পরবর্তী আলোচনায় আমরা শুধু বিশেষ সংবেদনগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব। ইন্দ্রিয়ের বিশেষত্ব অনুযায়ী বিশেষ সংবেদন পাঁচ রকম—দর্শন (Visual Sensation), শ্রবণ (Auditory Sensation), ত্বকজাত সংবেদন (Tactual Sensation), গন্ধ (Olfactory Sensation), স্বাদ (Gastatory Sensation)। এখন এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

দর্শন

[Vision]

মনোবিজ্ঞানে আর শরীরবিদ্যায় দৃষ্টি সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হ'য়েছে যে অন্যান্য সংবেদনগুলো সম্বন্ধে যা আলোচনা হ'য়েছিল, এর আলোচনা সেই সব আলোচনা গুলোকে একত্র করলে তার থেকে বেশী হ'বে। এর কারণ চোখ হ'ল আমাদের সব থেকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। দর্শন (Vision) আমাদের বেশীরভাগ অভিজ্ঞতা এবং আচরণের জন্য দায়ী। অভিজ্ঞতা না জন্মালে আমরা এই চিরপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বাঁচতে পারি না। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বেশীর ভাগ হয় চোখের দ্বারা। দর্শনের প্রধান উত্তেজক হ'ল সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকশক্তি। আধুনিক পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে এই আলোকশক্তি আমাদের চোখে আসে ইথারের মাধ্যমে। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোর দ্বারা ইথার কম্পিত হয় এবং তার ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা আমাদের চোখে প্রবেশ করলে আমাদের দর্শনের অনুভূতি হয়। কোন বস্তু আমরা তখনই দেখি যখন সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সেই বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। আবার ইথারের কম্পন অনুযায়ী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে। বিভিন্ন আলোকরশ্মির বিভিন্ন রকম তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সমস্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলো আমরা দেখতে পাই না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 760 — 390 $M\mu$ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালা আমাদের দর্শনের অনুভূতি দিতে পারে। $M\mu$ এই এককটির অর্থ হ'ল এক মিলিমিটারের ১/১০০০০০০ অংশ। ইথারে তরঙ্গ যদি 760 $M\mu$ এর বেশী হয় তাহ'লে আমরা দেখতে পাই না। আবার 390 $M\mu$ এর কম হ'লেও আমরা দেখতে পাই না। এই 760 — 390 $M\mu$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিমালাকে আমরা সাধারণতঃ বলি সাদা আলো বা White light। আর এর চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্যের তরঙ্গমালা যা আমাদের সাধারণ চোখে ধরা দেয় না তাকে বলা হয় লাল উজানী আলো বা Infra red rays আর এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্য সম্পন্ন তরঙ্গমালাকে বলা হয় বেগুনী পারের আলো বা Ultra-violet rays। সুতরাং বুঝতে পারলে আমরা এই সাদা আলো (White Light) ছাড়া খালি চোখে অন্য দুরকম আলো দেখতে পাই না। অর্থাৎ কেবল মাত্র এই মধ্যবর্তী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিমালা আমাদের দর্শনের বোধে সাহায্য করে।

এই সাদা আলো সম্বন্ধে আরো কিছু জান্‌বার আছে। এই যে সাদা আলো আমরা দেখি আসলে এটা কিন্তু সাত রং-এর সমষ্টি। এটা 1704 খৃষ্টাব্দে নিউটন আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে এই সাদা রশ্মিমালাকে একটা প্রিজম্ (Prism) এর মধ্য দিয়ে চালালে ঐ সাদা আলো রামধনুর যে সাতটা রং-এ বিভক্ত হয় একে বলে বর্ণালী। আবার এও দেখা গেছে এক একটি রং-এর এক একটি বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। অর্থাৎ এক একটি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের চক্ষে পড়লে আমাদের বিশেষ এক একটি রং এর বোধ হয়। আগেই বলেছি এই সাদা আলোতে 760 থেকে 390 Mμ পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন রশ্মি থাকে। এদের মধ্যে 760 Mμ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যদি আমাদের চোখে যায় তাহ'লে আমরা লালের বোধ পাই, আবার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যদি 400 Mμ কাছাকাছি হয় তবে আমরা বেগুনী রং দেখবো। তাই রামধনুর সবচেয়ে ওপরে থাকে লাল রং আর নীচে থাকে বেগুনী রং। বাকী যে রংগুলো আছে তাদেরও একটা বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে এই প্রসার (Range)-এর ভিতর। তাহ'লে আমরা এখন বলতে পারি এই সাতটা রং এক সংগে মিশে সাদা আলোর বোধ দেয়।

এই আলোচনা থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের দর্শন বোধ দু রকম হ'তে পারে। একটা হলো আলোর অনুভূতি, দ্বিতীয়টা হ'ল রং এর বোধ। আলো উজ্জ্বল সাদা থেকে একেবারে কালো বা অন্ধকার হ'তে পারে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার কালোটা রং নয় এটা হ'ল আলোর অনুপস্থিতি। আলোর উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে কমতে কমতে যখন একেবারে থাকে না তখন তাকে আমরা কালো বা অন্ধকার বলি। আলোর পরিমাণ যত কম্‌তে থাকে তখন সেটা ধূসর রং ধারণ করে। এই উজ্জ্বল আলো থেকে একেবারে আলো বিহীন অবস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়কে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সরলরৈখিক মাধ্যমে পরিবেশন (represent) করতে পারি। একে বলা হয় Achromatic series। ছবির সাহায্যে এটা দেখানো হ'ল।

এই Achromatic series-কে যত সোজা ভাবে দেখানো যায় বিভিন্ন রং-কে কিন্তু এরকম ভাবে দেখানো যায় না। এদের ছবির সাহায্যে দেখানো খুব কঠিন। তোমরা জান রামধনুতে সাতটা রং আছে। লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, তুঁতে আর বেগুনী। এবং সাতটা রংই আমরা দেখ্‌তে পাই। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত 760 Mμ থেকে কম্‌তে থাকবে আমরাও এই রংগুলো তত দেখতে পাই। একটা বর্ণালী (Spectrum) এর একেবারে বামদিক থেকে শুরু করলে প্রথম আমরা

দেখ্‌বো লাল। তারপর যত আমরা তার থেকে ডান দিকে আসবো আস্তে আস্তে লালটা বদলে কমলা রংএ পরিণত হবে। বিশুদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ কমলার মধ্যের জায়গায় লাল কমলার মিশ্রণে বিভিন্ন রকম রং থাকে। এর পর আরো ডান দিকে গেলে আমরা আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ হলুদ পাবো। তোমরা জান কমলা রং আর
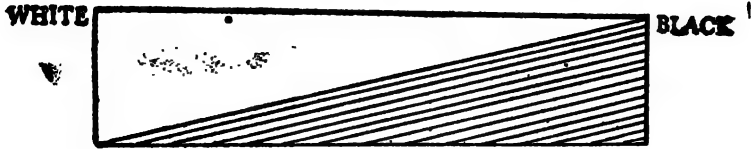
বর্ণহীন দর্শনানুভূতির বিভিন্ন পর্যায় (Achromatic Series)

হলুদ রং এর মধ্যে তফাৎ হ'ল এই যে কমলায় একটু লাল্‌চে আভা থাকে, হলুদেতে সেটা থাকে না। অর্থাৎ আমরা বল্‌তে পারি যে আস্তে আস্তে লালের প্রভাব বর্ণালী থেকে চলে যায়। তারপর আরো এগিয়ে গেলে আসে সবুজ এবং এর পরে নীল অর্থাৎ বর্ণালীতে নীলের সংযোগ হয়। নীল আর হলুদে মিশে প্রথমে সবুজ হয় তারপর হলুদ এর ভাগ আস্তে আস্তে কম্‌তে থাকে এবং সব শেষে এসে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ নীল। এ পর্যন্ত দেখে মনে হয় যে এই Achromatic series-কেও সরল রৈখিক ভাবে দেখানো যায়। কিন্তু এর পরেই হয় গণ্ডগোল। বিশুদ্ধ নীলের পর আমরা দেখি যে আমাদের বর্ণালীর আবার লাল্‌চে আভা আস্‌ছে এবং এটা সব শেষে গিয়ে বেগুনীতে দাঁড়ায়। এখন আমরা
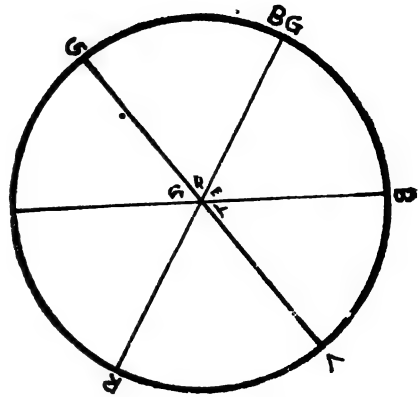
COLOUR CIRCLE
(বর্ণবৃত্ত)

এতে যদি আরো কিছুটা লাল বাড়িয়ে দিই এবং আস্তে আস্তে নীল আভাটা চলে যায় তাহ'লে আমরা দেখবো যে আমরা আবার বিশুদ্ধ-লাল যেখান থেকে আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম সেখানে পৌঁছে গেছি। এর থেকে বোঝা যায় এই Achromatic series-কে যদি একটা বৃত্তের পরিধির ওপর কল্পনা করা যায় তা

হ'লে বুঝতে সুবিধা হয়। প্রথম লাল থেকে সুরু ক'রে হলুদ, সবুজ, বেগুনী প্রভৃতি রং এর ভিতর দিয়ে আবার লাল এ ফিরে আসা যায়। একে আমরা বলতে পারি বর্ণ বৃত্ত (Colour Circle)।

বর্ণ শিখর [Colour Pyramid] : আগেই বলেছি প্রতি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমাদের একটি করে রং এর বোধ হয়। আমরা সাধারণতঃ বর্ণালীতে যে রংগুলো দেখি সেগুলো বিশুদ্ধ রং নয়। এতে সমস্ত রংগুলো মিশে থাকে। তবে বর্ণালীর এক একটা বিশেষ জায়গায় বিশুদ্ধ রং থাকে। আমরা বলতে পারি ঐ বর্ণ বৃত্তের পরিধির দিকে সব বিশুদ্ধ রংগুলো থাকে আর যত কেন্দ্রের দিকে এগোনো যায় ততই রংগুলো সব মিশতে সুরু করে। এর ফলে আমাদের রং এর অনুভূতিও বিভিন্ন হয়। বৃত্তের কেন্দ্রে সমস্ত রং মিশে একটা ধূসর রং ধারণ করে। এই মিশ্রণের অনুপাতকে বলে সংপৃক্ততা (Saturation)। আমাদের এই রং এর বোধকে আমরা একটা দু'মুখো শঙ্কু (Double Cone)-র সংগে তুলনা করতে পারি। ছবিতে যে অনুভূমিক বড় বৃত্তটা দেখছো ওর পরিধি বরাবর যদি আমরা সমস্ত বর্ণালীর বিশুদ্ধ রং-গুলোকে ভাবি আর কেন্দ্রে যদি ধূসর রং ধরি তা হ'লে আমাদের রং এর বোধের অনেক কিছুই বুঝতে পারা যায়। পরিধির উপর কোন বিশুদ্ধ রং থেকে সুরু করে বৃত্তে কোন ব্যাসার্দ্ধ বরাবর যত কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যায় তত সেই রং এর সংপৃক্ততা (Saturation) কমতে থাকে, অর্থাৎ আমরা নীল বরাবর যদি একটা ব্যাসার্দ্ধ টানি, তার উপর দিয়ে যত কেন্দ্রের দিকে এগুবো নীলটা আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হতে হতে কেন্দ্রে গিয়ে একেবারে ধূসর রং ধারণ করবে। অন্যান্য যে কোন রং এর বেলাই তাই ঘটবে। তা হ'লে আমরা এ দিয়ে রং এর দুটো গুণ বোঝাতে পারছি। একটা হল বিভিন্নতা আর একটা হ'ল সংপৃক্ততা। কিন্তু এ ছাড়াও রং এর বোধের একটা বিশেষ দিক আছে সেটা হ'ল এর উজ্জ্বলতা।
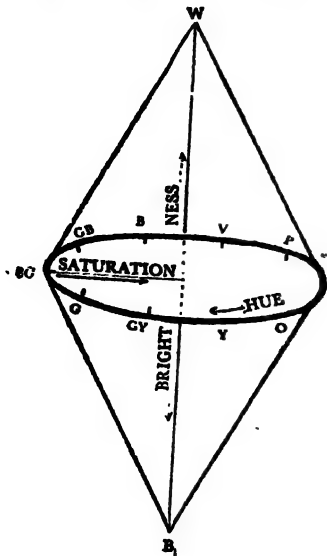
বর্ণ শিখর [Colour Pyramid]

উজ্জ্বলতার দিক থেকে রং এর তারতম্য ঘটতে পারে। এই উজ্জ্বলতা বোঝানোর জন্য আমরা ছবির উপর এবং নীচের দিকে আর একটা তলের (Plane) কল্পনা করি। ঐ বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে যদি একটা লাইন টানি এবং এর একদিকে যদি ভাবি সাদা আর একদিকে কালো তাহ'লে আমাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। এখন এই ছবিটা ঠিক একটা দু'মুখো শঙ্কুর (Double Cone) রূপ ধারণ করে। যে সব রং উজ্জ্বলতায় কম তারা প্রথমের ঐ বড় বৃত্তটার নীচের দিকে যে কোন কাল্পনিক বৃত্তের পরিধির উপর থাকে। আবার যে সব রং আরো বেশী উজ্জ্বল তারা উপরের দিকে যে কোন বৃত্তের পরিধির উপর থাকে। এই দুমুখো শঙ্কুকে বলে বর্ণ শিখর। এই বর্ণ শিখরের সাহায্যে আমরা তা হ'লে আমাদের রং-এর বোধের সমস্ত গুণকে পরিবেশন করতে পারি। এ ছাড়াও এ দিয়ে আমাদের আলোর বোধও পরিবেশিত হয় কারণ আলোর বোধের যা গুণ তা মাঝের সাদা থেকে কালো পর্যন্ত যে লাইনটা রয়েছে তা দিয়ে বোঝানো হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্ণ শিখর আমাদের সমস্ত রকম দর্শন গত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে।

রং এর মিশ্রণ [Colour Mixing]

আগের আলোচনা থেকে তোমরা জেনেছ যে প্রত্যেক রং এর এক একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের বিশেষ বিশেষ রং বোধ দেয়, কিন্তু এর উল্টোটা সব সময় হয় না। অর্থাৎ কোন বিশেষ রং সব সময় কোন বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না। আমরা হলুদ রং এর বোধ 510 $M\mu$ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ থেকে পাই। আবার সেই হলুদ রং-ই আমরা পাই 670 আর 590 $M\mu$ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে মেশালে। এই রকম বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশালে আমরা বিভিন্ন রং পাই। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা রং দেখি তা এই রকম মিশ্রণ থেকেই সৃষ্ট। কারণ সাধারণতঃ আমরা একেবারে শুদ্ধ (Homogenious) আলো পেতে পারি না। এই যে বিভিন্ন রং মিলে আমাদের একটা রং এর বোধ হয় একে বলে রং এর মিশ্রণ (Colour Mixture)। যেমন লাল আর হলুদ আলোকে মিশালে আমরা কমলা পাই।

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার দরকার—এই যে, রং এর মিশ্রণের ফলে আমরা একটা রং দেখছি একে কি আমরা বলবো যে আমাদের সংবেদনের মিশ্রণ হচ্ছে? এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। আসলে উত্তেজকগুলো মিশছে। যেমন ধর, ওপরে যে কমলার কথা বলেছি তাতে লাল আর হলুদ বোধ আলাদা করে হয় না। আসলে লাল আর হলুদ এক সংগে বিশেষ অনুপাতে মিশে আমাদের

চোখে পড়ে এর ফলে সংবেদন আমাদের একটাই হয় এবং সেটা কমলা রং এর।

এই রং এর মিশ্রণ কতকগুলো বিশেষ নিয়ম অনুসারে হয়। সেগুলো হ'ল :—

[1] বর্ণালীর প্রত্যেক রং এর সংগে এমন আর একটা বিশেষ রং আছে যে যখন তাদের বিশেষ অনুপাতে মেশানো হয় তখন আমাদের কোন রং এর বোধ থাকে না—ধূসর এর অনুভূতি হয়। মিশ্রণের উজ্জ্বলতা—দুটো রং-এর উজ্জ্বলতার মাঝামাঝি থাকে। আর ঠিক মত পরিমাণে না মেশালে, যে রংটি উজ্জ্বল মিশ্রণের মধ্যে তার প্রভাব বেশী থাকবে। এই যে জোড়া জোড়া রং এদের বলা হয় অনুপূরক রং (Complementary Colours)। অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অনুপূরক। যেমন—লাল আর সবুজ ; নীল আর হল্‌দে, সব অনুপূরক রং। এই সূত্রকে আমরা এই ভাবে লিখ্‌তে পারি—

লাল + সবুজ = ধূসর

নীল + হলুদ = ধূসর।

[2] যে সব রংগুলো নিজেদের মধ্যে অনুপূরক নয় তাদের যদি এক সংগে মেশানো হয় তাদের মিশ্রণে আমরা দুরকম রং-এরই অনুভূতি পাই। মিশ্রণের উজ্জ্বলতা তাদের প্রত্যেকের উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে। যেমন হলুদ আর লাল রং পরস্পর অনুপূরক নয় তাই তাদের মিশ্রণের ফলে আমাদের রং এর যে বোধ হয় তা হল্‌দে লাল (Yellowish Red) বা লাল্‌চে হল্‌দে (Redish Yellow) বা কমলা হয়। অর্থাৎ আমরা বল্‌তে পারি—

হলুদ + লাল = লাল্‌চে হলুদ (Redish Yellow) বা হলদে লাল (Yellowish Red) বা কমলা।

এই দুটো সূত্র স্যার আইজাক নিউটন 1704 সালে যখন বর্ণালী সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন তখন আবিষ্কার করেন। এ দুটো ছাড়া আরো একটা নিয়ম আবিষ্কার হয়েছে। এটা আবিষ্কার করেন গ্র্যাসম্যান (Grassman) 1853 খ্রীষ্টাব্দে। এই সূত্র থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন রং যখন মিশে নতুন রং সৃষ্টি করে সেটার দৃঢ়তা (Stability) কত। এই সূত্র অনুসারে—

(3) আমরা বিভিন্ন মিশ্রণের যখন মিশ্রণ করি তখন সেই মিশ্রণ পূর্বের মিশ্রণগুলোর সংগে কোন সম্পর্ক না রেখে যে কোন একটা মিশ্রণের রং ধারণ করে। এই দ্বিতীয় মিশ্রণের উজ্জ্বলতা ঐ মিশ্রণগুলোর উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে। যেমন—

লাল + সবুজ = ধূসর
নীল + হলুদ = ধূসর
[লাল + সবুজ] + [নীল + হলুদ] = ধূসর + ধূসর = ধূসর।

এর থেকে বোঝা যায় যে মিশ্রণের রং-এরও দৃঢ়তা আছে।

এই রং এর মিশ্রণের উপর আজ পর্যন্ত বহু গবেষণা হ'য়েছে। এই নিয়মগুলো যে একেবারে স্থির সত্য এ কথা জোর করে বলা যায় না। এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। তবে আপাতপক্ষে এর ভিতর কোন ভুল নেই। আর তাই এই নিয়মগুলোর উপর ভিত্তি করে একটা বড় ব্যবসায়ীর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে যার নাম হ'ল Colourimetry।

রং মিশ্রণের পদ্ধতি [Methods of Colour Mixing] : রং এর মিশ্রণ বিভিন্ন উপায়ে করা যায়, তবে সাধারণতঃ পরীক্ষাগারে যে ভাবে করা হয় তার বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল। এই পরীক্ষার জন্য দরকার—যে রংগুলো নিয়ে পরীক্ষা করতে চাও সেই রং এর কাগজ আর রেগুলেটারযুক্ত ইলেক্‌ট্রিক মোটর। প্রথমে লাল আর সবুজ দু'টো কাগজকে সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটো গোলাকার চাকতির আকারে কেটে নেওয়া হয়। এখন এদের কেন্দ্রে দুটো ছিদ্র করা হয় যাতে ওগুলোকে মোটরের যে দণ্ডটি ঘোরে তার মধ্যে ঢোকানো যায়। তারপর দুটো চাক্‌তির যে কোন একটা ব্যাসার্ধ বরাবর কেটে তাদের একটার ভেতর আর একটাকে এমনভাবে ঢোকানো হয় যে, যে কোন একটাকে সরালেই তাদের মধ্যে একটার পরিমাণ ছোট হয় এবং সংগে সংগে আর একটার পরিমাণ বাড়ে। এই চাকৃতিগুলোর চেয়ে আর একটু বড় ধূসর রং এর চাকৃতি নিয়ে তিনটেকে একসংগে মোটরের দণ্ডের সংগে এটে দেওয়া হয়। এখন এদের মোটরের সাহায্যে ঘোরালে আমরা দুটো রং এর মিশ্রণের ফলে একটা রং দেখতে পাই। তোমরা জান যে আমরা বিশুদ্ধ রং সাধারণতঃ পাই না। তাই এদের সমান অনুপাতে মেশালে যে ধূসর রং হবে এমন কোন কথা নেই। লালের উজ্জ্বলতা যদি বেশী হয় তাহ'লে ধূসর করতে হ'লে সবুজের পরিমাণ বেশী লাগবে, আবার সবুজের উজ্জ্বলতা বেশী হ'লে লাল বেশী লাগবে। রং মিশ্রণের প্রথম সূত্র পরীক্ষা করতে হ'লে একই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট রং ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ সমান অনুপাতে মেশালেই ধূসর পাব। আর সেই ধূসর রং পেছনের চাকৃতিটির সংগে মিশে যাবে। আবার তাদের উজ্জ্বলতা যদি বিভিন্ন হয় তাহ'লে ঐ চাকৃতিগুলো সরিয়ে বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন রং দিয়ে পেছনের ধূসর রং করা হয়। এর থেকে

আমরা বুঝতে পারি লাল কতটা লাগলো আর তার থেকে বুঝতে পারি দুটো রং এর আপেক্ষিক উজ্জলতা কিরূপ। এই ভাবে অন্যান্য সূত্রও পরীক্ষা করা যায়।

পরোক্ষ দর্শন [Indirect Vision]

এতক্ষণ আমরা বললাম আমাদের যে বিভিন্ন রং এর সংবেদন হয় তার মূল হ'ল আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এ ছাড়াও রং এর সংবেদন সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি আমাদের অক্ষিপটের যে কোন জায়গায় পড়লেই যে আমরা রং দেখতে পাব তার কোন মানে নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে আমাদের অক্ষিপটের (Retina) বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন রং এর বোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। 1825 খ্রীষ্টাব্দে পুর্কিনজি (Purkinji) সাহেব অনেক পরীক্ষার পর এই বিষয়ের উপর কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছান। সেগুলো হ'ল—

[1] অক্ষি পটের কেন্দ্র থেকে ক্রমশঃ পরিধির দিককার স্পর্শকাতরতা (Sensitivity) কম হয়।

[2] চোখের বিভিন্ন জায়গায় রং এর বর্ণ পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন রং এর অনুভূতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চল (Zone) আছে আমাদের অক্ষি পটে।
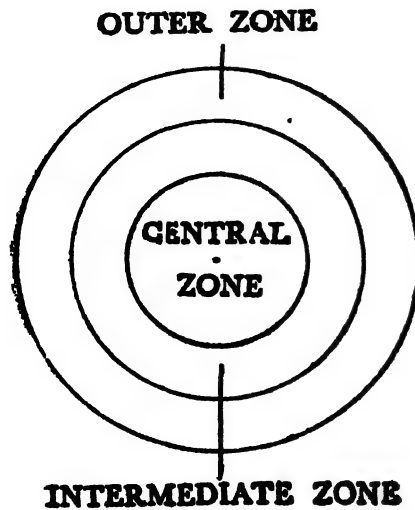
[3] সমস্ত রংই অক্ষি পটের পরিধির দিকে ধূসর দেখায়।

এই যে চোখের জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আমরা বিভিন্ন রং দেখছি তাকে পুর্কিনজি নাম দেন পরোক্ষ দর্শন বা Indirect Vision। যদিও পুর্কিনজি অক্ষিপটের অঞ্চলের কথা বলেছিলেন তবে এই অঞ্চলের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। তবে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা দিয়েছেন। আমাদের অক্ষিপটে তিনটে অঞ্চল আছে। একেবারে কেন্দ্রের কাছাকাছি পীত বিন্দু এবং তার চারদিকের কিছুটা অঞ্চলে সমস্ত রকম রং এবং আলোর সংবেদন হয়। একে

অক্ষিপটের অঞ্চল [Retinal Zones]

বলা হয় কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Central Zone)। এর পরের কতকটা জায়গায় লাল আর সবুজের সংবেদন হয় না। তবে নীল আর হলুদের সংবেদন হয়। একে বলা হয় মধ্য অঞ্চল (Intermediate Zo)। আর একেবারে অক্ষিপটের বাইরের দিকে কোন রং-এরই বোধ হয় না। শুধু সাদা কালো বা আলোর অনুভূতি হয়—একে বলা হয় বর্হিঅঞ্চল (Outer Zone)। এ ছাড়া আমাদের চোখের কেন্দ্রে একটা জায়গা আছে যেখানে কোন সংবেদনই হয় না। একে বলা হয় অন্ধবিন্দু Blind Spot)। এর সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে করবো। আমরা এই অক্ষিপটের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে তিনটে এক কেন্দ্রীয়বৃত্তের সাহায্যে পরিবেশন করতে পারি। পাশের পাতার ছবিতে তা দেখানো হ'ল।

• বর্ণ অন্ধ [Colour Blindness]

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষেরই বর্হিঅঞ্চল রং বোধের দিক থেকে অন্ধ থাকে। এটা সুস্থ চোখের লক্ষণ। কিন্তু অনেক লোকের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাদের দেখা গেছে বর্হিঅঞ্চল ছাড়াও এই অন্ধতা ভেতরের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সব লোকদের বলা হয় বর্ণ অন্ধ (Colour Blind)। 1777 খ্রীষ্টাব্দে হুড্রট্ Huddrat প্রথম এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কিন্তু তখন সবাই ততটা তাকেআমল দেয়নি। কিন্তু 1800 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত রাসায়নিক ডালটন (Dalton) রং সম্বন্ধে তার নিজের যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি নীল আর হলদে ছাড়া আর কোন রং-ই দেখতে পেতেন না। আর তখন থেকেই এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা শুরু হয়। সাধারণতঃ এই অন্ধত্ব তিন রকম হ'তে পারে।

[1] লাল আর সবুজ বর্ণ অন্ধ [Red and Green colour blindness] : নাম থেকেই বোঝা যায় এই সব লোকেরা লাল আর সবুজ রং দেখতে পায় না। এই রকমের অন্ধত্ব খুব বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই অন্ধত্ব আমরা বংশগত ভাবে পাই। এটা বেশীর ভাগ পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়।

[2] নীল হলুদ রং সম্বন্ধে অন্ধ [Blue Yellow blindness] : এ ধরনের লোকেরা নীল ও হলুদ রং দেখতে পায় না। এটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাল সবুজ অন্ধতার সংগে সংগেই আসে।

[3] সম্পূর্ণ বর্ণ অন্ধ [Total Colour Blindness] : এই সব লোকেরা কোন রংই দেখতে পায় না। এরা শুধু সাদা, কালো, ধূসর এই তিনটে রং দেখে। এরা বর্ণালীতে সাতটা রং এর বদলে বিভিন্ন উজ্জ্বলতা সম্পন্ন কয়েকটা জায়গা দেখে।

যদিও বিভিন্ন রকম রং সম্বন্ধে অন্ধ লোকেরা রং দেখতে পায় না তবুও দেখা গেছে তারা ঠিক ঠিক ভাবে বিভিন্ন রং এর নাম বলে দিতে পারে। এটা তাদের অভিজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে রং নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি বিশেষ রং সম্বন্ধে অন্ধ হয় তার পক্ষে সেই রং নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। ধর, যে গাড়ী চালাচ্ছে সে যদি লাল সবুজ রং সম্বন্ধে অন্ধ হয় তা হ'লে রাস্তার মোড়ের আলো সে বুঝতে পারবে না, ফলে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই আগে থেকে এই সব রং বর্ণ অন্ধ লোকদের বেছে বের করার জন্য অনেক রকম পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে সব চেয়ে এখন যেটা বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে তার নাম হ'ল ইশাহারা।

চক্ষু [Eye]

এতক্ষণ দর্শন আর রং এর সংবেদন সম্বন্ধে বললাম। এবার বলবো আমাদের এই সংবেদনের জন্য যে ইন্দ্রিয়টি দায়ী তার সম্বন্ধে। দর্শন ইন্দ্রিয় হ'ল চক্ষু (Eye)। এর সম্বন্ধে একেবারে শেষে আলোচনা করার কারণ হ'ল যে এতক্ষণ আমরা দেখলাম চোখের দ্বারা কি কি ঘটে। এখন তার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলবো কোন অংশটা কি রকম কাজের জন্য দায়ী।

আমাদের চোখ একটা ছবি তোলার ক্যামেরার মত। চোখের আকার প্রায় গোল। এটা একটা কোটরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। চোখের পাতার নীচে যে সাদা অংশ আমাদের অক্ষি গোলককে আবৃত করে রাখে তাকে বলে শ্বেতমণ্ডল (Sclerotica)। এই শ্বেতমণ্ডলের মাঝখানটা স্বচ্ছ এবং একে বলা হয় অচ্ছোদ পটল (Cornea)। এই অচ্ছোদ পটলের পেছনেই একটা কালো, বাদামী বা নীল রং এর গোল পর্দা আছে। একে বলা হয় কনিনীকা (Iris)। এই কনিনীকার মাঝখানে একটা কালো গোল ছিদ্র থাকে, একে বলে চক্ষু তারকা (Pupil)। চোখের এই সব অংশগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। এর পর চক্ষু তারকার পেছনে স্বচ্ছ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী একটা উত্তল লেন্স্ (Convex lens) থাকে। কতকগুলো পেশী এই লেন্স্‌টাকে অক্ষি গোলকের সংগে আটকে রাখে। এদের বলা হয় সিলিয়ারী প্রোসেসেস (Ciliary Processes)। এই পেশীগুলো সংকোচন ও প্রসারণের ফলে চোখের লেন্সের ফোকাসের দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। এই লেন্সের উপর কিছুটা ফাঁক জায়গা আছে এবং তার পরে আছে একটা কালো পর্দা। একে বলে অক্ষিপট (Retina)। এই অক্ষিপট আর লেন্স এর মাঝখানে যে জায়গাটা সেটা এক রকম তরল পদার্থ

দিয়ে ভর্তি। একে বলা হয় ভিট্রিয়াস্ হিউমার (Vitreous humour)।

চক্ষু তারকার মধ্য দিয়ে আলো এসে লেন্সের উপর পড়ে তারপর সেই আলো প্রতিসৃত হ'য়ে গিয়ে পড়ে অক্ষিপটে। এর ফলে আমরা কোন জিনিসকে দেখতে পাই। বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী আমাদের চোখের লেন্সের ফোকাসের দূরত্ব ছোট বড় হয়। অক্ষিপটকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এটা
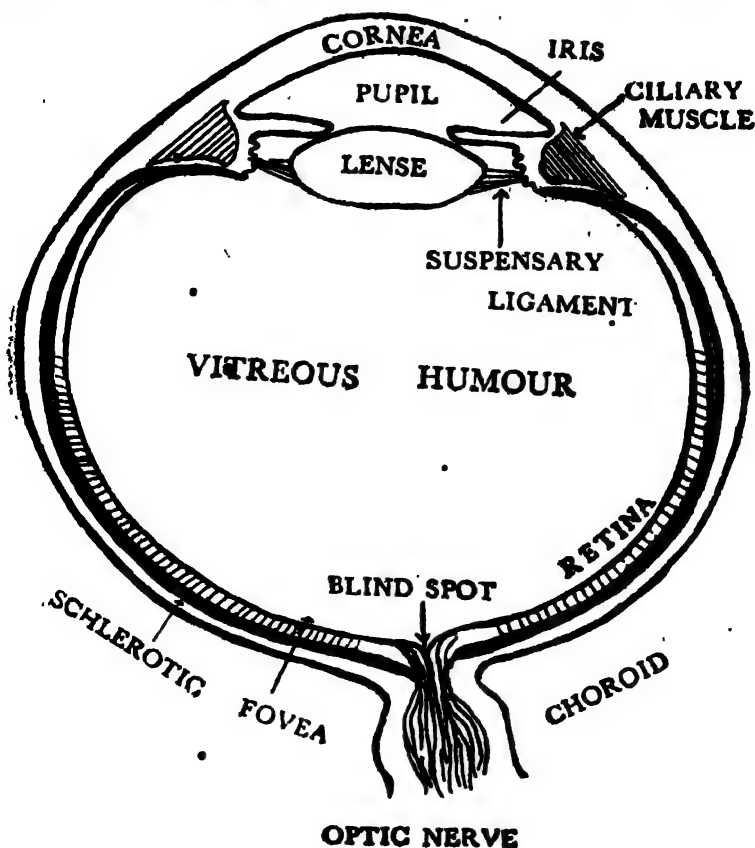
চক্ষু (The Eye)

অসংখ্য স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুপ্রান্ত (Nerve ending) দিয়ে তৈরী। এই স্নায়ু-প্রান্ত এখানে দু'রকম দেখা যায়। কতকগুলো হলো একটু লম্বা দেখতে এবং এদের কতকগুলো একটা মাত্র স্নায়ুতন্তুর সংগে জোড়া থাকে। আর এক রকমের যে গুলো আছে সে গুলো বেঁটে বেঁটে আর এদের প্রত্যেকের সংগে একটা

করে স্নায়ুতন্তু থাকে। প্রথম গুলোকে বলা হয় রড্ (Rod) আর দ্বিতীয় ধরনের গুলোকে বলা হয় কোণ্ (Cone)। এই স্নায়ুতন্তুগুলো এক সংগে মিলে চক্ষু স্নায়ু (Optic nerve) এর সংগে জুড়ে আছে। এটা আমাদের মস্তিষ্কে খবর নিয়ে যায়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে এটা আমাদের অক্ষিপটের সংগে মিলেছে। এই চক্ষু স্নায়ু অক্ষিপটে যেখানে এসে মিলেছে সেখানে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়লে আমরা দেখতে পাই না। একে বলে অন্ধ বিন্দু (Blind Spot)। এর চারপাশে কিছুটা জায়গা আছে যেখানে আমাদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর একে বলা হয় পীত বিন্দু (Fovea)। আমাদের পীত বিন্দুতে কোণ্-এর সংখ্যা বেশী থাকে আর বাইরের দিকে থাকে রড্ এর সংখ্যা বেশী। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে আমাদের রং এবং দিনের আলোর দর্শনের জন্য কোণগুলি দায়ী আর রাতের দর্শনের (Night vision) জন্য রড্গুলো দায়ী।

শ্রবণ

[Auditory Sensation]

টেলিফোন, রেডিও, ইত্যাদি বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো আজকাল আর আমাদের তত অবাক করে দেয় না যত তারা অবাক করেছিল তাদের প্রথম আবিষ্কার-এর সময়। সত্যি, অবাক হ'য়ে যেতে হয় যখন আমরা ভাবি ঐ ছোট জিনিসগুলো কি করে কথা, গান ইত্যাদি দূর থেকে আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে আসছে, কিন্তু এর চেয়েও যে একটা আশ্চর্য জিনিস আছে তার কথা আমাদের কোন সময়েই মনে পড়ে না। ভাবতে পার আমাদের কানগুলো ঠিক ঐ সব যন্ত্রের মত, কি তার চেয়েও অনেক নিখুঁতভাবে ঐ সব কাজ করে যাচ্ছে। এই কানই আমাদের শ্রবণের অনুভূতি দেয়। তাই কান সম্বন্ধে প্রথমে কিছু জানার দরকার।

কর্ণ [Ear]

গঠনের দিক থেকে আমরা কানকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি :—

[1] বহিঃকর্ণ (External ear), [2] মধ্য কর্ণ (Middle ear) আর [3] অন্তকর্ণ (Inner ear)।

[1] বহিঃকর্ণ (External ear) : সাধারণতঃ বাইরে থেকে কানের যেটুকু অংশ দেখতে পাই তাকে বলা হয় বহিঃকর্ণ। এখানে আছে কর্ণ পত্র (Pinna)। কান মলার সময় এটা আমরা ধরি। এর মাঝখানে একটা ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্র একটা নলের সংগে যুক্ত থাকে। এই ছিদ্রকে বলে কর্ণকুহর (Ear hole) এবং নলকে বলে বহির্নালি [Auditory Canal]। এই কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে একটা পর্দা আছে তাকে বলা হয় কর্ণপটহ (Ear drum)। এ পর্যন্তকে বলে কানের বহিঃ অংশ।

[2] মধ্যকর্ণ (Middle ear) : মধ্য কর্ণকে তিনটে হাড় সমন্বিত একটা গহ্বর বলা যেতে পারে। এই হাড় তিনখানাকে এক সংগে বলা হয় অস্থি বা Ossicles। এর মধ্যে একখানা হাড় দেখতে হাতুড়ির মত। এটা কর্ণ পটহের সংগে লেগে থাকে এবং বহিঃকর্ণ আর অন্তকর্ণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আকৃতি গত সাদৃশ্যের জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে হাতুড়ি (Hammer)। এই হাতুড়িটার সংগে আর একটা হাড় লেগে থাকে তাকে বলা হয় নেহাই

(Anvil), আর সব শেষে যেটা থাকে সেটা দেখতে পা দানির মত। একে বলা হয় রেকাবী (Stirrup)। এই তিনটে হাড়ের পর রয়েছে একটা পাতলা হাড়ের দেওয়াল। এই দেওয়ালে পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা দুটো ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র-গুলোর একটা দেখতে একটু লম্বা ধরনের, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ডিম্বাকৃতি বিবর (Oval window)। আর একটা দেখতে গোল সেটাকে বলে গোলাকৃতি বিবর (Round window)। এদের মধ্যে ডিম্বাকৃতি বিবরের ছিদ্রটার রেকাবীর
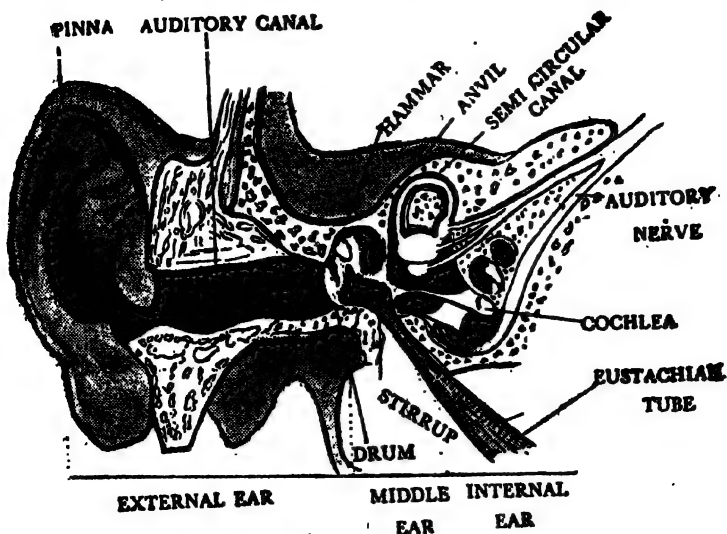
কর্ণ (The Ear)

এক প্রান্ত লেগে থাকে। আরো ভালো করে বলতে গেলে ঐ ছিদ্রের উপর যে পর্দা আছে তার সংগে লেগে থাকে। এর ফলে মধ্য কর্ণ আর অন্ত কর্ণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়। আর একটা বিবর যেটা গোল তার থেকে একটা নল বেরিয়ে গলার সংগে আমাদের কানের যোগ স্থাপন করে। এই নলটাকে বলা হয় শ্রুতি-নালী (Eustachian tube)। এটা আমাদের কান, গলা আর নাককে এক সংগে সংযুক্ত করে। এর কাজ হ'ল কর্ণপটহের উপর বাইরের আর ভেতরের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

[৩] অন্তঃকর্ণ [Inner Ear]: অন্তঃকর্ণ হ'ল কানের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ। অন্তঃকর্ণের ওপরের দিকে তিনটে অর্ধবৃত্তাকার নালী (Semi Circular

Canals) আছে। এরা পরস্পরের সংগে সমকোণে অবস্থিত। এদের ভেতর জল জাতি থাকে। এ ছাড়া অন্তঃকর্ণে শামুকের খোলার মত দেখ্তে একটা নল আছে। এটা হ'ল শ্রবণের আসল কেন্দ্র। একে বলা হয় শামুক নালী (Cochlea)। সমস্ত নালীটা একটা পর্দা দিয়ে লম্বালম্বি দিকে দুভাগে বিভক্ত। এই পর্দাকে বলা হয় Basilar membrane। তবে নালীর শেষের দিকটায় এই পর্দা নেই ফলে একটা নালীই আছে। এই নলের গা থেকে কতকগুলো স্নায়ুতন্তু বেরিয়ে মস্তিষ্কে গিয়েছে। এদের বলা হয় শ্রবণ স্নায়ু বা Auditory nerves। এই অন্তঃকর্ণের বাইরের দিক্টা বা মধ্য কর্ণের কাছাকাছিটা একটু মোটা। এই জায়গাটাকে বলা হয় অলিন্দ (Vestibule)। সাম্নের দিকে যে তিন্টে অর্ধবৃত্তাকার নালী আছে তারা এখানে এসে মিশেছে।

কি করে আমরা শুন্তে পাই [How we hear] ? : আমরা যদি কোন শব্দের উৎস অনুসন্ধান করি তাহ'লে দেখ্বো যে, কোন না কোন কম্পনশীল জিনিস থেকে শব্দ সৃষ্টি হ'চ্ছে। এই কম্পমান বস্তু ওর চারদিকে বাতাসে একটা কম্পনের সৃষ্টি করে। এখন এই বায়ুতরঙ্গ আমাদের কানে এলে আমরা শুন্তে পাই। তাহ'লে আমরা বল্তে পারি আলোর মত শব্দেরও তরঙ্গ আছে। এটা কানে এলে আমরা শুন্তে পাই ঠিকই ; কিন্তু কি করে ? কি ভাবে আমাদের কানের বিভিন্ন যন্ত্র কাজ করে তা জানার দরকার। কোন শব্দ তরঙ্গ প্রথমে এসে আমাদের বর্হিঃকর্ণের কর্ণ কুহরের মধ্য দিয়ে এসে কর্ণ পটহে (Ear drum) ধাক্কা দেয়, ফলে কর্ণ পটহে একই রকম কম্পনের সৃষ্টি হয়। এখন এই কম্পন মধ্য কর্ণে হাতুড়ি নেহাই আর রেকাবীর দ্বারা সংবাহিত হ'য়ে অন্তঃকর্ণে শামুক নালীতে গিয়ে পৌছায় এবং অবস্থিত তরলের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে। আগেই বলেছি শামুক নালী Basilar membrane দিয়ে দুভাগে বিভক্ত। শব্দ তরঙ্গ শামুক নালীর একদিক দিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। এখন এই শব্দ তরঙ্গ শামুক নালী দিয়ে চলাচলের সময় এর গায়ে যে সব স্নায়ুতন্তু আছে তাদের উত্তেজিত করে। সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে গিয়ে আমাদের শ্রবণের অনুভূতি দেয়। তাই কানের যে কোন অংশে একটু কোন গণ্ডগোল হ'লে সম্পূর্ণ যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে আমরা শুনতে পাই না।

শ্রবণের বা শব্দ সংবেদনের বিশেষত্ব
[Characteristics of Auditory Sensation]

শব্দ তরঙ্গ আমাদের কানের মধ্যে এলে আমাদের শব্দের সংবেদন জাগায়। এখন আমরা যে শব্দ শুনি তা বিভিন্ন দিক থেকে পৃথক হ'তে পারে। প্রথম হ'ল

তারা সহজ বা সরল (Simple) হ'তে পারে। আবার জটিল (Complex হ'তে পারে। সরল (Simple) শব্দে আমরা একটি মাত্র তরঙ্গ জনিত শব্দ শুন্তে পাই। বৈজ্ঞানিক অর্থে শব্দ বলতে একেই বোঝায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সরল শব্দ (Simple tone) শুনতে পাই না বললেই চলে। সাধারণতঃ আমাদের কানে যে শব্দ আসে তা বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গের সমষ্টি উদ্ভূত। একে বলা হয় জটিল শব্দ বা মিশ্র শব্দ (Combination tone)। যখন এই মিশ্রশব্দ গুলো নিয়মিত বা শৃঙ্খলিত (Unifrom) হয় তখন সৃষ্টি হয়—যেমন হয়—যে কোন বাদ্য যন্ত্রে, তখন সৃষ্টি হয় গানের স্বর (Musical tone)। আবার মিশ্র শব্দ যখন অনিয়মিত বা বিশৃঙ্খল হয় তখন গণ্ডগোলের (Noise) সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়াও আরও কতকগুলো দিক থেকে শব্দের সংবেদনকে পৃথক করা যায়। এই সব গুণ গুলো নিয়ে বহুদিন থেকে মনোবিজ্ঞানী ও পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করেছেন। তাদের সেই আলোচনা থেকে আমরা শব্দের সংবেদনের কতকগুলো গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। এখানে যে সব গুণগত পার্থক্যের কথা বলছি সেগুলো সরল শব্দের জন্যই বেশী প্রযোজ্য। এই সব গুণ-গত পার্থক্যগুলো আসতে পারে—

(i) স্বরগ্রামের (Pitch) দিক থেকে : প্রত্যেক শব্দের একটা করে নিজস্ব স্বরগ্রাম আছে। এটা হ'ল শব্দের সেই বিশেষ গুণ যার দ্বারা ব'লতে পারি একটা শব্দ থেকে আর একটা শব্দ আলাদা। এটা নির্ভর করে শব্দ তরঙ্গের সংখ্যার (Frequency) উপর। যেমন—'সা'—আর 'রে' মধ্যে স্বরগ্রামের পার্থক্য আছে।

(ii) শব্দের উচ্চতা (Loudness) : গত দিক থেকে প্রত্যেক স্বরগ্রাম আবার উঁচু বা নীচু হ'তে পারে। অর্থাৎ একই স্বরগ্রামকে খুব উঁচু করতে পারি বা খুব নীচু করতে পারি। "সা, রে……" আমরা হারমনিয়মের বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু করে একটা স্বরগ্রাম ঠিক রেখে বাজিয়ে গেলে বিভিন্ন উচ্চতা সম্পন্ন শব্দ পাব। এটা নির্ভর করে শব্দ তরঙ্গের উচ্চতার Amplitude) উপর।

(iii) উজ্জলতার দিক থেকে (Intensity) : কোন শব্দ খুব স্পষ্ট আবার কোন শব্দ খুব আবছা মনে হয় আমাদের কাছে। একে বলা হয় শব্দের গভীরতার (Intensity) পার্থক্য।

[iv] আয়তন গত দিক থেকে (Volume) : সাধারণতঃ দেখা যায় যে নীচু স্বরগ্রামের শব্দের আয়তন বেশী হয় আর উঁচু স্বরগ্রামের শব্দের আয়তন কম হয়।

নীচু স্বরগ্রামে গাইতে হলে আমাদের মোটা গলায় গাইতে হয়। আবার উঁচু স্বরগ্রামে খুব সরু গলায় গাইতে হয়।

[v] ঘনত্বের (Density) দিক থেকে : মনোবিজ্ঞানী টিচেনার (Titchener) বলেন যে শব্দ যত উঁচু স্বরগ্রামের হয় তার আয়তন তত কমতে থাকে কিন্তু ঘনত্ব বাড়ে। অর্থাৎ যদি শব্দ তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা (Frequency) বাড়ানো হয় শব্দের আয়তন বাড়ে কিন্তু ঘনত্ব কমে।

শব্দের সংবেদন সম্বন্ধে আর একটা জানবার জিনিস হ'ল যে, সমস্ত শব্দ তরঙ্গ আমাদের কানে গিয়ে শব্দের সংবেদন জাগাতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যদি শব্দ তরঙ্গের কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে 20,000 বারের বেশী হয় তবে ঐ শব্দ আমরা শুনতে পাই না। আবার যদি 20 বারের কম হয় তাহ'লেও শুনতে পাই না। সেকেণ্ডে 20 বারের কম কম্পনে বা 20,000 বারের বেশী কম্পনে যে শব্দের সৃষ্টি হয় ঠিকই তবে আমরা সে সব শব্দ শুনতে পাই না। এই সব শব্দকে বলে শ্রুতিপারের শব্দ [Supersonic Sound]।

ত্বকজাত সংবেদন [Cutaneous Sensation]

কোন বস্তু যখন আমাদের শরীরের কোন অংশকে স্পর্শ করে তখন একরকম সংবেদন হয় তাকে বলা হয় স্পর্শজনিত সংবেদন (Tactual Sensation) বা ত্বকজাত সংবেদন (Cutaneous Sensation)। ত্বকজাত সংবেদন একে বলা হয় তার কারণ এ সংবেদনের সংগ্রাহক বা ইন্দ্রিয় হ'ল আমাদের শরীরের ত্বক। এই ত্বকের সাহায্যে আমাদের অনেক রকমের অনুভূতি হয়। সে গুলো হ'ল— [1] স্পর্শানুভূতি (Contact), [2] চাপের অনুভূতি (Pressure), [3] উষ্ণতার অনুভূতি (Hot), [4] শৈত্যের অনুভূতি (Cold), [5] বেদনার অনুভূতি (Pain), [6] সুড়সুড়ির অনুভূতি (Tickle) [7] কঠিন বা কোমলের অনুভূতি (Hard or soft), [8] মসৃণ অথবা বন্ধুরতার অনুভূতি (Smooth or Rough), [9] শুষ্ক অথবা সিক্তের অনুভূতি (Wet or dry).

এখন যদি আমরা ত্বকের কিছুটা জায়গা নিয়ে প্রত্যেক বিন্দুর গুণ পরীক্ষা করি দেখবো যে এর বিভিন্ন বিন্দুগুলো বিভিন্ন উত্তেজনায় সংবাদ দেয় এবং আমাদের বিভিন্ন রকম অনুভূতি দেয়। এই যে স্পর্শ সংবেদনের বিভিন্নতা এটা নির্ভর করছে ত্বকে বিভিন্ন বিন্দুর গুণের উপর। আমরা হাতের উপর কালির দাগ দিয়ে যদি সেখানে প্রত্যেক বিন্দুতে বিভিন্ন রকম উত্তেজক (Stimulus) দিই তাহ'লে দেখবো যে কতকগুলো বিন্দু শুধু চাপের অনুভূতি দেয় (Pressure touch)। আবার

কতকগুলো দেয় উষ্ণতার, কতকগুলো দেয় শৈত্যের বাকি কতকগুলো দেয় বেদনার অনুভূতি। তিনজন শরীর বিজ্ঞানী ব্লিক্স (Blix), গোল্ডসিডার (Gold Schider) আর ডোনাল্ডসন (Donaldson) প্রায় একই সংগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জিনিসটি আবিষ্কার করেন। এরা তিনজন তিন দেশের লোক। প্রথম জন হ'লেন সুইডেনের দ্বিতীয় জন জার্মানী আর শেষজন হ'লেন আমেরিকার।

এদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিক ভন্‌ ফ্রে (Von Frey) এই বিন্দু নির্ণয়ের উপর অনেক পরীক্ষা করেন। তিনি চাপ এবং বেদনার বিন্দুগুলোকে বের করার জন্য Hair holder ব্যবহার করেন এর বিশদ বিবরণ Practical অংশে দেওয়া হবে। একটা এক ইঞ্চি লম্বা চুল একটা কাঠের হাতলে বাঁধা থাকে। তা দিয়ে তিনি ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে চাপ দেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাসের চুল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে আমাদের ত্বকের উপর বেদনার আর চাপের অনুভূতির জন্য আলাদা আলাদা বিন্দু আছে। যে বিন্দুতে আমরা চাপ বা স্পর্শের অনুভূতি পাই সেই বিন্দুতে বেদনা অনুভব করি না।

আবার একটা তামার অথবা ব্রোঞ্জের সরু রন্ধ্রে (Cylinder) তাপমাত্রার পরিবর্তন করে ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে বসালে দেখবো যে কতকগুলো বিন্দু শুধুই উষ্ণতার অনুভূতি দেয় আর কতকগুলো দেয় শৈত্যের। সাধারণতঃ দেখা গেছে শৈত্য বিন্দু উষ্ণ বিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় বেশী থাকে।

সংখ্যাগত হিসাবে দেখতে গেলে আমাদের ত্বকে সবচেয়ে বেশী থাকে বেদনার বিন্দু—তারপর স্পর্শ বা চাপের বিন্দু। এরপর শৈত্য বিন্দু। আর সবচেয়ে কম থাকে উষ্ণ বিন্দু। অনেক সময় দেখা গেছে এই বিন্দুগুলো স্থির থাকে না। যেমন—আজকে আমরা পরীক্ষাগারে ত্বকের একটা বিশেষ জায়গায় যে সব বিভিন্ন বিন্দুগুলো বের করবো কালকে বের করতে গেলে সেগুলো নাও পেতে পারি। তাহ'লে কি আমরা বলবো যে এই বিন্দুগুলো স্থির থাকে না? এটা ঠিক নয়। আমাদের পরীক্ষার ভুলের জন্য আমরা এই ভুল আপাত: পক্ষে দেখতে পাই। এই ভুলের কারণগুলো হ'ল : [1] ত্বকের উপর বিন্দুগুলো প্রায় এক মিলিমিটার দূরে দূরে থাকে সুতরাং সেগুলো দেখাতেই ভুল থাকতে পারে। [2] যে জায়গায় বিন্দুগুলো বের করছি সে জায়গায় ত্বক যদি আলগা থাকে তাহলে ভুল হবে [3] যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করছি সেগুলোর ভুল থাকলে আমাদের পরীক্ষা ভুল হ'তে পারে।

ত্বকের গঠন [The Structure of the skin]: আমরা দেখলাম যে

আমাদের ত্বক থেকে বিভিন্ন রকম সংবেদন পেয়ে থাকি। অনেকে ভাবেন যে আমাদের ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে যখন বিভিন্ন রকমের সংবেদন হয় তখন সেখানে বিভিন্ন রকমের সংগ্রাহক (Receptor) আছে। তাদের এই ধারণা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রায় সত্যে পরিণত হয়েছে। আমরা ত্বকের কিছুটা কেটে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করি দেখবো যে এর নীচে বহু রকম স্নায়ু তন্তু আছে এই ত্বকের ওপরের দিকটাকে বলা হয় এপিডারমিস্ (Epidermis) আর ভেতরের দিকটাকে বলে ডারমিস্ (Dermis)। এই নীচের স্তরেই বিভিন্ন রকমের স্নায়ু-তন্তুর প্রান্তভাগ এসে মিলেছে এবং এগুলো সব চুলের গোড়ার সংগে জোড়া আছে। আমাদের ডারমিস এ যে সব স্নায়ুতন্তু দেখা যায় সেগুলো হ'ল :—
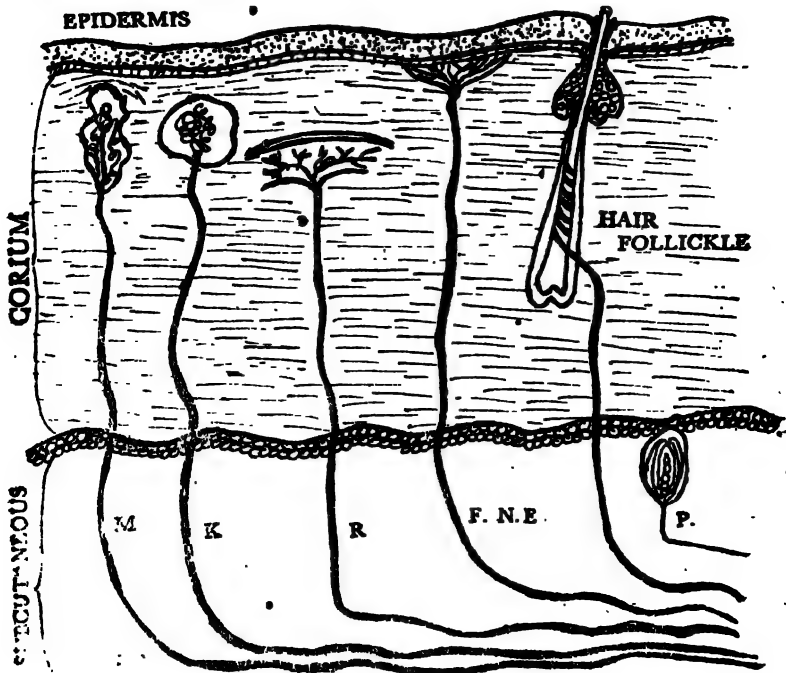
ত্বকের গঠন [The Structure of the Skin : M = Meissner : K = Krauss ; P = Pacinian, R = Ruffini, F. N. E. = Free Nerve Ending]

[a] বিভিন্ন স্নায়ু শাখার মুক্ত প্রান্ত (Free end of the nerve fibre) খুব বেশী পরিমাণে ত্বকে দেখা যায়।

[b] চুলের গোড়ার সংগ্রাহক (Hair receptor): আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা চুল কতকগুলো স্নায়ুর শেষ প্রান্তের ভেতর পোতা রয়েছে। এর জন্য আমাদের চুলে কিছু উত্তেজনা এলে এর অনুভূতি পাই।

[c] মেইজনার কর্পাসলস্ (Meissner Corpuscles): এগুলো সাধারণতঃ শরীরের চুল বিহীন স্থানে দেখা যায়। এগুলোকে চাপের বা স্পর্শের সংগ্রাহক হিসাবে ধরা হয়।

[d] ক্রজ্ কর্পাসলস্ (Krause Corpuscles): এগুলো দেখতে গোল বলের মত। এগুলো সাধারণতঃ শৈত্য বিন্দুতে থাকে, অর্থাৎ এগুলো আমাদের শৈত্যের অনুভূতি দেয়।

[e] প্যাসিনিয়ান কর্পাসলস্ (Pacinian Corpuscles): এগুলো স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে। এগুলোও চাপের অনুভূতি দেয় তবে মেইজনার কর্পাসলস্ এর সংগে এর পার্থক্য হ'ল যে প্রথমগুলো ঈষৎ চাপের অনুভূতি দেয় আর এগুলো দেয় তীব্র চাপের অনুভূতি।

[f] রুফিনি কর্পাসলস্ (Ruffini corpuscles): এগুলো দেখতে ঠিক পদ্মপাতার মত। এগুলো আমাদের বেদনার অনুভূতি দেয়।

তাহ'লে বুঝতে পারছো যে আমাদের বিভিন্ন ত্বকজাত সংবেদনের মূলে আছে এই স্নায়ু প্রান্তগুলো। যখন কোন কিছু সাধারণ উষ্ণতার জিনিস আমাদের ত্বককে স্পর্শ করে বা কোন গরম বা ঠাণ্ডা জিনিস লাগে তখন ঠিক সেখানে ত্বকের নীচে স্নায়ুপ্রান্তগুলো উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে গেলে আমরা বিভিন্ন অনুভূতি পাই। এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সাহায্য করে ত্বকের উপরের চার রকমের কেন্দ্র আর তাদের প্রত্যেকের নীচেকার বিভিন্ন রকম স্নায়ু প্রান্ত। যদি অন্য কোন উত্তেজক অন্য কোন বিন্দুতে প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে আমরা কোন অনুভূতি পাই না। যদি কোন ঠাণ্ডা জিনিস চাপ বা স্পর্শ বিন্দুতে দেওয়া হয় তাহ'লে স্পর্শেরই অনুভূতি পাবো। ঠাণ্ডার কোন অনুভূতি পাবো না। এই বিন্দুগুলো আমাদের ত্বকের সব জায়গায় সমান সংখ্যায় থাকে না। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিন্দুর সংখ্যা বেশী থাকে, যেমন—চোখের অচ্ছোদে (Cornea) মুক্ত স্নায়ু প্রান্ত বেশী থাকে অর্থাৎ বেদনা বিন্দু বেশী থাকে। যার জন্য ওখানে সামান্য কিছু জিনিস লাগলেই আমরা বেদনা অনুভব করি। আবার আঙুলের ডগায় স্পর্শ বিন্দু বেশী থাকে। গালে উষ্ণ বিন্দু বেশী থাকে।

স্বাদের সংবেদন

[Gustatory Sensation]

সাধারণতঃ আমরা উত্তেজক বলতে বুঝি কোন পার্থিব শক্তি (Physical energy), কিন্তু পার্থিব শক্তি ছাড়াও উত্তেজক হ'তে পারে। রাসায়নিক কোন দ্রব্যও উত্তেজকের কাজ করতে পারে। এই রকম রাসায়নিক দ্রব্য থেকে উদ্ভূত সংবেদন হ'ল স্বাদ (Taste)। স্বাদ দুরকম—সরল ও যৌগিক—আধুনিক মত অনুযায়ী চারটে মাত্র প্রাথমিক স্বাদ আছে। সেগুলো হ'ল—[1] মিষ্টি, [2] তেতো, (3) লবণ আর [4] টক্। এদের বিশিষ্ট উত্তেজক গুলো হ'ল যথা-ক্রমে চিনি, কুইনাইন, সোডিয়াম ক্লোরাইড আর হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

যৌগিক স্বাদ গুলো হ'ল এই সব সরল বা প্রাথমিক স্বাদ গুলোর মিশ্রণে হয়। নুন আর মিষ্টি এক সংগে মিশিয়ে খেলে এক রকম কসা স্বাদ পাই। আমাদের দু'টো স্বাদ একসংগে মিশে একটা নতুন স্বাদের সৃষ্টি করে সেই জন্য একে বলা হয় যৌগিক স্বাদ।

বর্তমান পদার্থ বিদ্যার মত অনুযায়ী আমাদের এই স্বাদের মূল উৎস হ'ল বিভিন্ন জিনিসের পারমাণবিক গঠন। এ ছাড়াও দেখা গেছে যে আমাদের জিহ্বার বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন রকম স্বাদ গ্রহণ করে।

স্বাদের বিভিন্ন স্থান (The different Region of taste) : বড় মানুষদের চেয়ে ছোট ছেলেদের স্বাদের স্থান বিস্তৃতি খুব বেশী। বয়স্কদের জিহ্বার মধ্যের অংশ কোন স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু ছোট ছেলেদের তা পারে। ছোট ছেলেদের স্বাদ বোধএর স্থান সমস্ত মুখে ছড়িয়ে থাকে যেমন ঠোঁট, গাল, মাড়ি প্রভৃতিতে। বড় মানুষদের জিহ্বাই শুধু স্বাদের ইন্দ্রিয় হিসাবে ধরা হয়।

জিহ্বা [The Tongue]
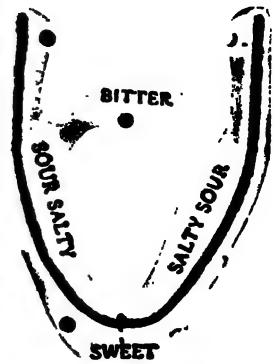
আমরা যদি জিহ্বাকে খুব নিখুত ভাবে পর্যবেক্ষণ করি দেখবো যে এটা অসংখ্য ছোট ছোট উঁচু ঢিপির মত জিনিস দিয়ে আবৃত, একে বলা হয় প্যাপেলি (Papillae)

এই প্যাপেলি গুলো চার রকম হয়। [1] Pilform Papillae, এগুলো আমাদের স্বাদ বোধে কোন সাহায্য করে না। [2] Fungiform Papillae, এগুলো জিহ্বার সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। [3] Faliate Papillae এগুলো থাকে জিহ্বার দু পাশের দিকে (4) Circumvallate Papillae এগুলো থাকে গোড়ার দিকে। প্রত্যেক প্যাপেলিতে একটা বেশী স্বাদ কোরক (Taste Bud) থাকে। এই স্বাদ কোরক (Taste Bud) কতকগুলি করে লাট্টুর মত দেখতে সংগ্রাহক কোষ (Receptor Cell) থাকে। আবার প্রত্যেক কোষের শেষ ভাগ থেকে একটা করে সরু চুলের মত জিনিস মুখ গহ্বরের দিকে বেরিয়ে থাকে। এই কোষগুলি হ'ল স্বাদ বোধের আসল সংগ্রাহক (Receptor। এই কোষগুলো স্নায়ুতন্তু দিয়ে করোটি স্নায়ু হ'য়ে মস্তিষ্কের সংগে সংযোগ স্থাপন করেছে।

চার রকম প্রাথমিক স্বাদের উত্তেজক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে জিহ্বার এই বিশেষ বিশেষ রকমের প্যাপেলি গুলো বিশেষ বিশেষ রকম স্বাদ দিতে সক্ষম।

জিহ্বার সংগঠন
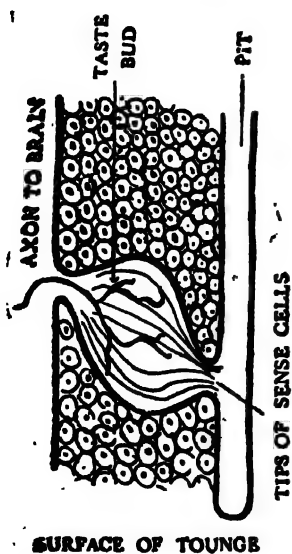
Fungiform প্যাপেলির কতকগুলো শুধু মিষ্টি স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। আবার কতকগুলো শুধু টক আর বাকি কতকগুলো শুধু লবণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। এরা একেবারে তেতো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। আবার Circumvallate প্যাপেলি গুলো তেতো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এই সব প্যাপেলির অবস্থান অনুযায়ী আমরা জিহ্বার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম স্বাদ পাই। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে আমাদের জিহ্বার একেবারে গোড়ার দিকটা তেতো স্বাদ গ্রহণে সক্ষম। আবার মিষ্টি ঠিক উল্টো—এই স্বাদটা আমরা জিহ্বার একেবারে ডগায় পাই। পাশের দিকগুলোতে ওপরে এবং নীচে টক আর লবণের স্বাদ পাওয়া যায়। আগেই বলেছি মাঝখানটায় বিশেষ কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

গন্ধের সংবেদন

[Olfactory Sensation]

আমরা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন রকম গন্ধ পাই। গন্ধের অনুভূতি হয় আমাদের নাসিকা দ্বারা। যদিও আমরা সাধারণভাবে ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় বলতে নাসিকাকে বুঝি, তবে আপাতঃপক্ষে বাইরে থেকে তার যে অংশটা দেখি আমাদের ঘ্রাণের সংবেদনের জন্য তার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। এখানে একটা জিনিস মনে রাখার দরকার চোখ যেমন আমাদের দেখার জন্য, কান যেমন আমাদের শোনার জন্য, এরকম নাক শুধু ঘ্রাণের জন্য নয়। এর সব চেয়ে যেটা বড় কাজ সেটা হ'ল শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করা। তাই এই নাকের সব অংশটাকে আমরা ঘ্রাণের সংগ্রাহক হিসাবে ব'লতে পারি না। এখানে আমরা নাকের সেই অংশটার কথা আলোচনা করবো যে অংশটা আমাদের ঘ্রাণের সংবেদন দেয়।

আমাদের ঘ্রাণের সংগ্রাহক হ'ল নাকের মধ্যে একেবারে ওপরের দিকে অবস্থিত দুটো ছোট ছোট জায়গা। এই দুটো নাকে দুটো ছিদ্রের একেবারে শেষ প্রান্তে আছে। নাকের মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের যে পথআছে এ দুটো জায়গা তার পাশের দিকে থাকে। এদের বলা হয় Epithelium। এগুলো যে শুধু নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথ থেকে একপাশে আছে তাই নয়, যাতে বাতাস যাওয়া আসার অসুবিধা না হয় তার জন্য এদের পাশে একটা করে নরম হাড়ের বাঁধের মত দেওয়া আছে। এই Epithelium গুলো এক রকম থলথলে পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। Epithelium-এ থাকে অসংখ্য গন্ধ স্নায়ুকোষ (Olfactory Receptor)। ঐ সব স্নায়ুকোষের চুলের মত ডগা গুলো ঐ থলথলে পদার্থের মধ্যে বেরিয়ে থাকে। এই সব স্নায়ু-কোষের কাজ হ'ল বাতাসের মধ্যেকার গন্ধের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া। আর
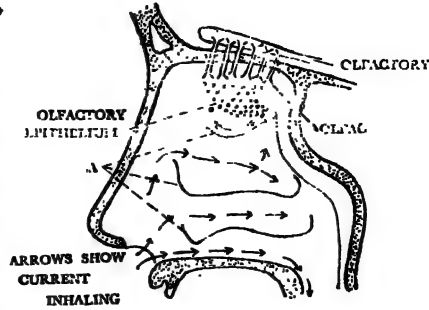
নাসিকা [The Nose]

একটা জিনিস বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে আমাদের Epithelium যেহেতু বায়ু চলাচলের পথের উপর বসানো নেই সেহেতু নিশ্বাসের সমস্ত বায়ুটা গিয়ে এতে লাগে না। আমরা নিশ্বাস নেওয়ার সময় যখন টান দিই তখন কিছুটা বাতাস নাকের ভিতর দিয়ে সোজা ফুসফুসে যায়। খুব সামান্য অংশই দিক পরিবর্তন করে আমাদের Epithelium-এ লাগে। আর এই বাতাস থেকেই আমাদের গন্ধের সংবেদন হয়। আবার অনেক সময় পেছন দিক থেকে বাতাস আসে যার জন্য মুখে কিছু গন্ধ খাবার দিলে তার গন্ধ আমরা অনুভব করি।

গন্ধের উত্তেজনা সব সময়েই গ্যাসীয় অবস্থায় আমাদের নাকে আসা উচিত। ধর গোলাপের গন্ধ আমরা কি করে পাচ্ছি? যে বাতাস ফুলের উপর দিয়ে বয়ে আমাদের নাকে এসে ঢুকছে, তা সংগে করে কিন্তু ফুলের বায়বীয় কণা নিয়ে আসছে। এই কণাগুলো Epithelium এর স্নায়ুকোষের উপর এক ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া করে যার খবর স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে যায় এবং এর ফলে আমরা গন্ধ পাই।

গন্ধের সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ

[Classification of Olfactory Sensations]

আমাদের গন্ধের সংবেদন কত রকম আছে এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। সত্যি কোনগুলো যে আসলে প্রাথমিক গন্ধ তা বলা বিপদ। তবে মনোবিজ্ঞানী জ্বাড়মেকার (Zwaardemaker) এই সংবেদনকে নয়টা ভাগে ভাগ করেছেন। তার মতে আমরা মূলতঃ এই নয় ধরনের গন্ধ পাই—

[1] ইথারে গন্ধ (Ethereal Smell):

(a) ফুলের গন্ধ (b) মৌচাকের মোমের গন্ধ
(c) ইথার (d) এলডিহাইড্ (e) কিটোনস্

[2] সুগন্ধ (Aromatic Smell):

(a) কর্পুর (b) মশলার গন্ধ (c) লেবুর গন্ধ

[3] স্নিগ্ধকারী গন্ধ (Balsamic Smell):

(a) চামেলী যুঁই, (b) কমলালেবুর ফুল, (c) পদ্ম

[4] চন্দন বা মৃগনাভির গন্ধ (Amber Musk Smell):

(a) চন্দন (b) মৃগনাভি।

[5] পচা দুর্গন্ধ (Allyle-Cacodyle Smell):

(a) হাইড্রোজেন সালফাইড, পচা ডিমের গন্ধ
(b) মাছের গন্ধ

[6] পোড়া গন্ধ (Burning Smell) :

(a) তামাক পোড়ার গন্ধ

[7] গা-গোলানো গন্ধ বা বমি উদ্রেককারী গন্ধ (Nauseating Smell) :

(a) পচা জিনিসের গন্ধ (b) মল

[8] বিরক্তিকর গন্ধ (Repulsive Smell) :

(a) ছারপোকার গন্ধ, (b) অচৈতন্যকারী ওষুধের গন্ধ।

[9] চিত্ত চাঞ্চল্যকর গন্ধ (Caprylic Smell) :

(a) বেড়ালের মূত্র (b) জনন রসের গন্ধ।

স্বাদ এবং গন্ধ এই দু'রকম সংবেদন সম্বন্ধে একটা জিনিস মনে রাখার দরকার যে দৈনন্দিন জীবনে এই দুটো সংবেদন খুব কম সময়েই আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় পেয়ে থাকি। এগুলো সাধারণতঃ অন্যান্য সংবেদনের সংগে মিশে থাকে। যেমন আমাদের সামনে পেঁয়াজ থাকলে আমরা গন্ধ পাই। এখানে আমাদের দু'রকম সংবেদন কাজ করে। দর্শন আর গন্ধ। আবার অনেক সময় খেলে গন্ধ পাই তখনও দু'রকমের সংবেদন কাজ করে স্বাদ আর গন্ধ। এই সব কারণে আমরা দৈনন্দিন জীবনে স্বাদ গন্ধ এই দু'রকম রাসায়নিক উত্তেজনা (Chemical Stimulus) উদ্ভূত সংবেদন বিশুদ্ধ অবস্থায় পাই না।

গন্ধ সম্বন্ধে একটা বিশেষ জিনিস বলার এই যে কোন গন্ধ যদি অনেকক্ষণ নাকের কাছে রাখা হয় তখন আমাদের আর সেই গন্ধের অনুভূতি থাকে না। এর কারণ হ'ল আমাদের Epithelium খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল (Fatigue) হ'য়ে পড়ে। তবে এই দুর্বলতা বিশেষ সেই গন্ধের জন্য। আবার অন্য গন্ধ দিলে আমাদের গন্ধের অনুভূতি ফিরে আসে। এই কারণেই যারা রাস্তায় ময়লা পরিষ্কার করে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়

QUESTIONS

1. What is meant by sensation and sensory Psychology? Why sensation is regarded as a border line experience between physical and mental experiences?

2. Define sensation and make a broad Classification of them.

3. How are colours seen ? How can you represent all the phenomena of vision in a single figure ?

4. "Our visual sensation can be represented in a tri dimensional spindle"—Explain.

5. What do you mean by indirect vision ? Explain with figure. How will you determine the retinal zones in the lb orato

6. What do you know about colour blindness ? Explain their Cansation with special reference to the retinal zones.

7. State and explain the laws of colour mixture.

8. Describe with a diagram the structure and function of the eye.

9. explain the mechanism of hearing with a short des cription of the ear.

10. Describe the characteristics of the sound stimulus and sound sensation.

11. What do you mean by skin spots ? How would you detect them ?

12. Give a brief description of the skin with special reference to the sensative pot.

13. Write a short essay on Epicretic Sensation.

14. Write a short essay on any one of the Sensations arising out of chemical stimulation.

15. What are basic tastes and what are the characteristic stimuli that evoke them ? Show with the help of a diagram how they are differentiated in the tongue.

16. Describe the mechanism of smelling and in this conection attempt to classify smell according to the mental reaction they create in us.

17. "In oun practical life the chemical sensations are rarely isolated"—Discuss.

18. Write short notes on :—
(a) Colour blindness ; (b) Retinal Zones ; (c) Colour pyramid ; (d) Achromatic and chromatic Series ; (e) Inner ear ; (f) Cochlea ; (g) Pitch, loudness, intensity ; (h) Simple and Complex tones ; (i) Taste buds ; (j) Cold and hot Spot ; (k) Basic tastes ; (l) Supersonic Sound (m) Epithelium.

19. The following are Some of the parts of sense organ :
(a) Retina, (b) Cochlea, (c) Ossciles, (d) Epithelium, (e) Taste bud, (f) Pacinian Corpuscle.

Name the Sense organ to which they belong. Explain in brief their Structures and functions.

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

ও পরা-ভাব

[Image and after image]

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান আহরণ করি আমাদের সংবেদনের সাহায্যে। সংবেদন যদি না থাকতো তাহ'লে এই সব জ্ঞান আমাদের হতো না। সংবেদন উত্তেজকের বর্তমানেই সম্ভব। অর্থাৎ একটা বিশেষ ছবির বর্তমানেই আমাদের তার থেকে সংবেদন হয় এবং আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই সংবেদন আমাদের মনে একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনে। এর ফলে আমাদের মনে ছবিটা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা হয়। সেই ছবি পরে হয়তো আমরা আর কোন দিন দেখি না কিন্তু একবার প্রত্যক্ষণের ফলে সেটা আমাদের মনে একটা বিশেষ ধারণা রেখে যায়। এই ধারণা কোন সময় নিক্রিয় থাকে না। পরে হয়তো কোনদিন নির্জনে বসে বসে ভাবতে ভাবতে সেই ছবির কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের চোখের সামনে ঠিক সেই ছবির একটা প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। এ রকম অভিজ্ঞতা তোমাদের অনেক আছে। ধর একদিন রাস্তায় কোন লোককে গাড়ী চাপা পড়তে দেখেছিলে। পরে যখন কোনদিন সেই কথা মনে পড়ে তখন তোমাদের চোখের সামনে সেই রাস্তার দৃশ্যটা ভেসে উঠে। এই যে ছবি আমাদের চোখের সামনে উদয় হয় একে বলে কল্প বা ভাবমূর্তি (Image)। এটাকে আমরা ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষণের উত্তেজক বলতে পারি।

ভাবমূর্তি যে কেবল আমাদের অতীত অভিজ্ঞতারই হ'তে পারে তা নয়। আমাদের মনে এমন সব জিনিসেরও ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় যার প্রকৃত অভিজ্ঞতা কোন দিনই ছিল না। যেমন যখন আমরা পরীর কথা ভাবি। পরীর প্রকৃত অভিজ্ঞতা আমাদের কোনদিনই ছিল না, তবুও যখন আমরা এর কথা ভাবি তখন আমাদের মনে ঠিক একটা বিশেষ ধরনের প্রাণীর ছবি ভেসে উঠে। এটাও এক ধরনের ভাবমূর্তি।

তাহ'লে যখন অতীত কোন ঘটনা বা কাল্পনিক কোন ঘটনার ছবি কোন বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে ভেসে ওঠে তখন তাকে আমরা বলবো কল্প

বা ভাবমূর্তি (Image)। অন্য ভাবে বলতে গেলে যখন কোন প্রকৃত অভিজ্ঞতার বা অপ্রকৃত ঘটনার প্রতিচ্ছবি বাইরের কোন উত্তেজক ছাড়াই আমাদের মনের মধ্যে সৃষ্ট হয় তখন তাকে বলা হয় ভাবমূর্তি। মনোবিজ্ঞানী থরন্ ডাইক (Throndike) বলেছেন প্রকৃত অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের যে সব মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, আমাদের মন যদি সেই সব প্রক্রিয়া নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারে তাহ'লেই আমাদের ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা ব'লে এই নয় যে ভাবমূর্তি আর প্রকৃত প্রত্যক্ষণ একই জিনিস। তাই প্রথমেই এদের তুলনা মূলক আলোচনা প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষণ আর ভাবমূর্তির মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা

[Comparative study of Perception and Image]

যে কোন ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা হয় কল্পের সাহায্যে। প্রত্যক্ষণ বা প্রকৃত অভিজ্ঞতা যে মানসিক বস্তুকে অবলম্বন করে হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষরূপ বা (Percept)। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাবমূর্তি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা উদ্ভূত তবুও প্রকৃত প্রত্যক্ষণ আর ভাবমূর্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। পরবর্তী আলোচনায় যদিও সব জায়গায় প্রত্যক্ষণের কথা বলবো তবুও মনে রাখতে হবে আসলে আমাদের এ আলোচনা কিন্তু দু'রকম কল্পের মধ্যে—প্রত্যক্ষরূপ আর ভাবমূর্তি।

[1] আমাদের প্রত্যক্ষণ হয় উত্তেজকের বর্তমানে। অর্থাৎ যখন রাস্তায় কোন দৃশ্য দেখি তখন তা আমাদের সামনে থাকে। প্রত্যক্ষণে আমরা প্রকৃত সংবেদনগত অভিজ্ঞতা পাই। কিন্তু এই ঘটনার পরে অন্য কোথাও গিয়ে যখন আমাদের সেই দৃশ্য মনে পড়ে তখন তাকে বলি আমরা ভাবমূর্তি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণে উত্তেজকের উপস্থিতি প্রয়োজন কিন্তু ভাবমূর্তির সময় তা প্রয়োজন হয় না। এমন কি ঘোর অন্ধকারেও আমরা ভাবমূর্তির জন্য কোন জিনিস দেখতে পাই। এ দেখা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষণ নয়।

[2] আবার উত্তেজক আমাদের সংবেদন জাগালেই একটা না একটা প্রত্যক্ষণ হবেই। কিন্তু কল্প বা ভাবমূর্তি যেহেতু উত্তেজকের উপর নির্ভর করে না সেহেতু এই ভাবমূর্তি সৃষ্টির পেছনে একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভাবমূর্তি নির্ভর করে আমাদের মানসিক অবস্থার ওপর। তাহ'লে প্রত্যক্ষণ বেশীর ভাগ উত্তেজক বা সংবেদন নির্ভর কিন্তু ভাবমূর্তি মানসিক অবস্থা নির্ভর। যেমন—রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘট্‌লে আমরা দেখবো কিন্তু তার ভাবমূর্তি মনে আনা সেটা আমার বিশেষ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে।

[3] এদের সম্বন্ধে আর একটা জিনিস জানবার আছে সেটা হ'ল যে প্রত্যক্ষণ বিভিন্ন সংবেদন উদ্ভূত বস্তু সম্বন্ধে একটা একক জ্ঞান। যেমন—রাস্তায় পুলিশের গাড়ী, এ্যাম্বুলেন্স, লোকের ভিড় আর কোন লোককে রাস্তায় ছটফট করতে দেখে আমরা একটা একক দুর্ঘটনার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ভাবমূর্তি আমাদের খণ্ড খণ্ড প্রত্যেকটা জিনিসের হতে পারে। অর্থাৎ আনাদের শুধু সেই লোকটার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করার ছবি মনে পড়তে পারে বা যে কোন অন্য একটা অংশেরও হ'তে পারে। তাই আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষণ আমাদের সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ছবি দেয় কিন্তু ভাবমূর্তি আমাদের বিচ্ছিন্ন ছবি দেয়।

[4] ভাবমূর্তি বা কল্প খুব ক্ষণস্থায়ী হয়। এখুনি আমাদের মনে একটা ছবি আসে আবার পরের মুহূর্তে অন্য ছবি দেখা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণের সময় তার ছবি যতক্ষণ উত্তেজক থাকে ততক্ষণই আমাদের সামনে থাকে।

[5] কোন বস্তু প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের শরীরের বাহ্যিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। যেমন কোন জিনিস দেখতে হ'লে তার দিকে তাকাতে হয়। মাথা ঘুরাতে হয়। প্রয়োজন মত চোখ নাড়া চাড়া করতে হয়। কিন্তু ভাবমূর্তির সময় প্রকৃত কোন প্রত্যক্ষণের বস্তু না থাকায় কোন শারীরিক অবস্থানের পরিবর্তন দরকার হয় না।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তু নির্ভর। কিন্তু ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষণ নির্ভর। সুতরাং সময়ের পার্থক্যও তাদের মধ্যে আছে। বস্তুর বর্তমানেই প্রত্যক্ষণ, আর তার পরে বস্তুর অবর্তমানে হয় মানসিক ভাবমূর্তি অর্থাৎ ভাবমূর্তির অতীতকাল হল প্রত্যক্ষণ।

ভাবমূর্তির শ্রেণী বিভাগ

[Classification of Images]

আগেই বলেছি ভাবমূর্তি আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত বা কল্পনা উদ্ভূত দুইই হ'তে পারে। অর্থাৎ আমাদের মনে যে বস্তুর ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় তার প্রকৃত অস্তিত্ব থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সুতরাং ঐদিক থেকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি—[1] অতীত অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তি (Images of past real experiences) আর [2] কল্পনার ভাবমূর্তি (Images of imagination) যখন বসে বসে হঠাৎ অনেকদিন আগে দেখা কোন ঘর পোড়ার দৃশ্য আমাদের মনে ভেসে ওঠে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠে তা হ'ল প্রকৃত অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তি। আবার যখন নরসিংহের মূর্তি কল্পনা

করি তখন তার যে ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে তাকে বলবো কল্পনার ভাবমূর্তি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে যখন তোমরা কল্পনা (Imagination) পড়বে। এখন বিশেষ করে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তির কথাই বলবো।

জগৎ সম্বন্ধে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-জাত সংবেদনই আমাদের অভিজ্ঞতার মূল। আবার এই সব অভিজ্ঞতা চিরস্থায়ী হওয়ার পেছনে আমাদের যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা হ'ল স্মৃতি। তাই আমরা অভিজ্ঞতাকে মোটামুটি ভাবে দুভাগে ভাগ করতে পারি। কতকগুলো হ'ল অস্থায়ী অভিজ্ঞতা (Temporary experiences)। এর মধ্যে আমরা সব সংবেদন গুলোকে ফেলতে পারি। আর কতকগুলো অভিজ্ঞতা যেগুলোকে আমাদের নিজের প্রয়োজনে বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্থায়ী করে রেখেছি এবং দরকার হ'লে তাদের যে কোন সময় চেতন মনে আনতে পারি। এর ভেতর আমরা সাধারণতঃ স্মৃতিকে ফেলতে পারি। তাহ'লে অভিজ্ঞতার স্থায়ীত্বের দিক থেকে আমরা অনুভূতিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—(1) সংবেদন গত ভাবমূর্তি (Sensory Image)। এগুলো আমাদের অস্থায়ী অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তি। আর (2) স্মৃতিগত ভাবমূর্তি (Memory Image)। এগুলো আমাদের স্থায়ী অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তি।

সংবেদনগত ভাবমূর্তি (Sensory image) : মানসিক ভাবমূর্তি হ'ল আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুর ছবি। আগেই আলোচনা করেছি ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষণের মত একটা সর্বাঙ্গীণ ছবি নয়। এটা বিচ্ছিন্ন ছবি। অতএব আমরা এগুলোকে সংবেদনের ছবি হিসাবে বলতে পারি। কারণ সংবেদনও যেমন বিচ্ছিন্ন আমাদের ভাবমূর্তি গুলোও তেমনি বিচ্ছিন্ন। এখানে একটা জিনিস জানার দরকার ছবি বলতে আমরা সাধারণতঃ দর্শন উদ্ভূত কোন প্রতিচ্ছবিকে বুঝি। কিন্তু আসলে আমরা এখানে যে ছবি বা ভাবমূর্তি দেখি তা শুধুই প্রতিচ্ছবি নয়। এটা হ'ল মানসিক ছবি। অর্থাৎ আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে আমাদের চিন্তা করা বা কল্পনার মানসিক অবলম্বন। এ দিক থেকে দেখতে গেলে ভাবমূর্তি শুধুমাত্র দর্শনগত সংবেদনের হয় না। প্রত্যেক প্রকার সংবেদনেরই ভাবমূর্তি হ'তে পারে। তাই সংবেদনকে যেমন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা যায় ঠিক তেমনি ভাবমূর্তিকেও ভাগ করা যায়। ধর দোকানে কোন একটা সুন্দর খেলনা দেখবার পর হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছো। খেলনাটা তোমার ভালো লেগেছে। তুমি সেটার কথা ভাবতে লাগলে, সংগে সংগে তোমার মনে

একটা ছবি ভেসে উঠলো। তুমি দোকানে যেমনটি দেখেছিলে সেই রকম একটি খেলনা তোমারি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই ভাবমূর্তি সৃষ্টি হ'চ্ছে চোখের দ্বারা তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে চিত্রধর্মী ভাবমূর্তি (Visual Image)।

আবার ধর ঐ খেলনাটা হয়তো একটা শিম্পাঞ্জীর ছিল। আর সেটা স্প্রিং এর সাহায্যে ঘুরে ঘুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। তুমি যখন পরে হাঁট্তে হাঁট্তে ঐ কথা ভাবছিলে তখন শুধুমাত্র ওর ছবিটা তোমার সামনে ভেসে ওঠে নি, ঐ শব্দটার কথাও মনে হয়েছে। আর যেন ঠিক সেই শব্দটাও তোমার কানে বাজছে। আবার একলা বসে যখন কোন বন্ধুর কথা ভাব মাঝে মাঝে মনে হয়তুমি যেন তার অবিকল স্বর শুনতে পাচ্ছ। এই সব গুলো শব্দের ভাবমূর্তি। এদের সৃষ্টির জন্য আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কান দায়ী। তাই এদের বলা হয় শব্দধর্মী ভাবমূর্তি (Auditory image)।

এমনি ভাবে আমাদের ত্বকজাত ভাবমূর্তিও হ'তে পারে। যেমন বহুদিন আগে হয়তো শীতকালে কাশ্মীর গিয়েছিলে। এখন বসে বসে কোন বন্ধুর সংগে সেই সব গল্প করছো। হঠাৎ যখন সেই বরফ পড়ার কথা মনে পড়লো তখন তোমার গা শির শির করে উঠলো। ধর কোনদিন তোমার দরজার ফাঁকে হাত চেপে গিয়েছিল, তারপর বহুদিন পরে যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ঠিক সেই জায়গায়ই বেদনা অনুভব কর। তাহ'লে এই সব ত্বক জাত সংবেদনের জন্য ত্বকের মাধ্যমে আমাদের যে ভাবমূর্তি হয় তাকে বলা হয় স্পর্শধর্মী ভাবমূর্তি (Tactual Image)।

এ ছাড়াও যখন কোন নিমন্ত্রণে খাওয়া বিশেষ কোন খাবারের কথা মনে পড়ে তখন আমরা জিহ্বায় সে জিনিসের স্বাদ অনুভব করি। আবার সুন্দর গন্ধ বিশিষ্ট কোন ফুলের কথা মনে পড়লে আমরা তার গন্ধ অনুভব করি। এই সব ভাবমূর্তিকে ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী যথাক্রমে বলা হয় স্বাদধর্মী (Gustatory Image) আর ঘ্রাণধর্মী ভাবমূর্তি (Olfactory Image)।

তাহ'লে তোমরা বুঝতে পারছো প্রায় প্রত্যেক রকম সংবেদন থেকেই আমাদের ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়। তাহ'লে আমরা বলতে পারি শুধু কবিরা নয় আমরা সবাই মানসচক্ষুতে দেখতে পাই, মানস কর্ণে শুনতে পাই আবার মনে মনেই স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ অনুভব করি। এই হিসাবে আমরা সংবেদন গত ভাবমূর্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি—দর্শনধর্মী ভাবমূর্তি (Visual Image), স্পর্শধর্মী ভাবমূর্তি (Tactual Image), শব্দ বা ধ্বনী ধর্মী ভাবমূর্তি (Auditory Image),

স্বাদধর্মী ভাবমূর্তি (Gustatory Image) আর ঘ্রাণধর্মী ভাবমূর্তি (Olfactory Image)।

এই সব ভাবমূর্তিগুলোর মধ্যে আমরা সচরাচর যেটার অস্তিত্ব বেশী উপলব্ধি করি সেটা হ'ল দর্শনগত ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তি গুলো বেশী উজ্জ্বল হয়। এর কারণ হ'ল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই পাই। আর এই ইন্দ্রিয়, বস্তু সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান দেয়। এর চেয়ে কম পরিষ্কার (clear) হয় শব্দধর্মী ভাবমূর্তি। তারও চেয়ে আবছা হয় স্পর্শধর্মী ভাবমূর্তি। আর একেবারে আবছা হয় ঘ্রাণ আর স্বাদধর্মী ভাবমূর্তি।

এখানে স্বভাবতঃ তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই পাঁচটি সংবেদন ছাড়াও আমাদের তো আরো দু রকম সংবেদন আছে। যেমন যান্ত্রিক সংবেদন আর পেশীয় সংবেদন। তাদেরও তো ভাবমূর্তি থাকতে পারে? তা নিশ্চই হয়। কিন্তু সেগুলো খুব আবছা আর সচরাচর হয় না। তাই তাদের সম্বন্ধে এখানে আর বিশেষ আলোচনা করলাম না।

স্মৃতিগত ভাবমূর্তি [Memory Image] : যখন আমরা পূর্বে শেখা কোন জিনিস স্মরণ করি তখন আমাদের মনে যে ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্মৃতি-গত ভাবমূর্তি। যেমন কোন কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে আগে শেখার সময় বইয়ে দেখা লাইন গুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এদিক থেকে বলতে গেলে সংবেদন গত ভাবমূর্তি, আর স্মৃতিগত ভাবমূর্তির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কারণ কোন কিছু স্মরণ করতে হ'লে আমাদের ইন্দ্রিয়গত ভাবমূর্তিই হয়। তবে এটুকু পার্থক্য তাদের মধ্যে আমরা আনতে পারি যে সংবেদনগত ভাবমূর্তির পেছনে অনেক সময় চেতন ইচ্ছা থাকে না কিন্তু স্মৃতিগত ভাবমূর্তির সৃষ্টির পেছনে একটা চেতন ইচ্ছা থাকে। তা ছাড়া শুধু মাত্র সংবেদনের পেছনে আমাদের চেতন ইচ্ছা থাকে না কিন্তু স্মৃতিতে আমরা যে অভিজ্ঞতা রাখতে চাই তাকে অধ্যয়নের সময়ও একটা চেতন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং কোন কিছু স্মরণ রাখার জন্যও তেমনি মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। আর শেষের মানসিক ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য অর্থাৎ স্মরণ করবার জন্য যে মানসিক অবলম্বনের সাহায্য নিই তাই হ'ল স্মৃতিগত ভাবমূর্তি। অর্থাৎ এখানে আমরা যখন ইচ্ছাপূর্বক কোন কবিতা স্মরণ করি তখন সেই কবিতার একটা ভাবমূর্তি আমাদের মনে সৃষ্টি হয়। তবে একটা জিনিস এখানে মনে রাখবার দরকার প্রত্যেক স্মৃতিগত ভাবমূর্তিই হয় কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই

কারণে অনেকে আবার সংবেদনগত ভাবমূর্তিকে বলেন প্রাথমিক স্মৃতিগত ভাবমূর্তি (Primary Memory Image)। এই সব ভাবমূর্তি গুলো আমাদের মনে এমনিই আসে। আর যেগুলোকে আমরা চেষ্টা করে আনি তাদের নাম দিয়েছেন শুধুই স্মৃতিগত ভাবমূর্তি (Memory Image)।

কতকগুলি বিশেষ ধরণের ভাবভাবমূর্তি—পরাভাবমূর্তি, আইডেটিক ইমেজ, শাব্দিক ভাবমূর্তি। [Some special types of Images—After Image, Eidetic Image, Verbal Image] : সংবেদনগত আর স্মৃতিগত ভাবমূর্তি ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের ভাবমূর্তি আমাদের মনে সৃষ্টি হয়। এই সব ভাবমূর্তির বিশেষ গুণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের এই দুটোর কোন দলেই ফেলা যায় না। সেগুলো হ'লো :—

[1] **পরা ভাবমূর্তি** [After Image] : যখন কোন একটা জিনিসের দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমরা চোখটা সরিয়ে নিই তখন সংগে সংগেই তার সংবেদনটি চলে যায় না। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে বস্তু উদ্ভূত কোন উত্তেজনা অর্থাৎ সংবেদন বস্তু অপসারণের পরও কিছুক্ষণ থাকে। তার পর সেটা আস্তে আস্তে চলে যায়। তাই আমরা অনেকক্ষণ যদি কোন একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকি তারপর একটা সাদা পর্দার দিকে মনোনিবেশ সহকারে তাকাই তাহ'লে প্রথম কিছুক্ষণ আমরা ঐ জিনিসের একটা প্রতিকৃতি চোখের সামনে দেখবো। এই ধরনের প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় পরামূর্তি (After image)।

এই প্রতিচ্ছবি রং এর প্রত্যক্ষণের সময় কিন্তু ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন আমরা অনেক সময় ধরে একটা লাল জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটা ধূসর বা সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তা'হলে প্রথম কিছুক্ষণের জন্য ঐ রকম একটা লাল রঙের জিনিস দেখ্‌বো ঠিকই। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ যদি ঐ পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহ'লে একটা আশ্চর্য ধরনের অনুভূতি হয়। ঐ লাল বস্তুটার প্রতিচ্ছবির রং আস্তে আস্তে বদলে যায়, এবং সবুজ রং ধারণ করে। এই ধরনের ভাবমূর্তি একবার করে আমাদের সামনে আসে আবার মিলিয়ে যায়। এও দেখা গেছে প্রথম যদি আমরা সবুজ রঙের কোন জিনিসের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে আমাদের প্রতিচ্ছবি হয় লাল রঙের। এর থেকে দেখা যাচ্ছে এই সব ধরনের প্রতিচ্ছবিতে আমরা প্রকৃত রং এর অনুপূরক রং দেখতে পাই। এদেরও আমরা ব'ল্‌বো পরা ভাবমূর্তি।

উপরের এই আলোচনা থেকে তোমরা বুঝ্‌তে পারছো এই পরা-ভাবমূর্তির দু'টো পর্যায় (stage) আছে। মনোবিজ্ঞানীরা এই পর্যায়গুলোর বিশেষ গুণ বিবেচনা করে আলাদা আলাদা দুটো নামকরণ করেছেন। কোন জিনিসের সংবেদন বস্তু অপসারণের পর কিছুক্ষণ থাকে। অর্থাৎ আমরা লাল জিনিসের প্রতিচ্ছবি লালই দেখি। এই পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা তাকে বলা হয় সদর্থক পরা-ভাবমূর্তি (Positive After Image)। কিন্তু এটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা অনুপূরক রঙের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। এই প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় নঞর্থক পরা ভাবমূর্তি(Negative After image)। এই সব প্রতিচ্ছবিগুলোকে ভাবমূর্তি বল'লে ভুল করা হয়। কারণ এগুলো আমাদের সংবেদনের তৎক্ষণাৎ পরিণতি। তাই অনেকে এদের বলেন সংবেদনের তৎক্ষণাৎ পরিণতি (After effect of Sensation)। তবুও বহুদিন থেকে মনোবিজ্ঞানীরা এর আলোচনা ভাবমূর্তির মধ্যে করে এসেছেন।

পরীক্ষাগারে পরা ভাবমূর্তির বিশেষত্ব আমরা ক্যাম্পিমিটার (Campimeter) দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। এটা আর কিছুই নয় একটা বড় আয়তাকার সাদা বোর্ড, দুদিকে ক্লিপ দিয়ে দণ্ডের (stand) সংগে আটকানো যায়। এই বোর্ডের একদিকে যে রং নিয়ে পরীক্ষা করা হয় সেই রং এর একটা এক বর্গ সেন্টিমিটার আন্দাজ ছোট কাগজ লাগানো হয়। এর পর পরীক্ষার্থীকে খুব মনোযোগ সহকারে ঐ রং কাগজের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলা হয়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ঐ বোর্ডের পাশে সাদা অংশের দিকে তাকাতে বলা হয় এবং যা দেখছে তা বলতে বলা হয়। দেখা গেছে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী প্রথমে সদর্থক পরা ভাবমূর্তির এবং পরে নঞর্থক পরা ভাবমূর্তির কথা বলে। পরীক্ষার সময় কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়। সেগুলো হ'ল—বোর্ডের ওপরকার রঙের কাগজটা যেন পরীক্ষার্থীর ঠিক চোখের সোজা সুজি থাকে। পরীক্ষার্থীকে ঐ বোর্ড থেকে প্রায় ৩০ সে. মি. দূরে বসানো হয়। রঙের কাগজটা যেন সমভাবে কাটা হয়। পরীক্ষার্থীর অন্যমনস্ক না হওয়া উচিত।

[2] **আইডেটিক ইমেজ** [Eidetic Image] : আমাদের সংবেদন-গত ভাবমূর্তির যেমন এক রকমের বিশেষ রূপ দেখা যায়, তেমনি স্মৃতিগত ভাবমূর্তির বেলায়ও দেখা যায়। 1930 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান মনোবিজ্ঞানী জ্যেনস্ (Jaench) ভাবমূর্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেন যে আমাদের সাধারণ স্মৃতিগত ভাবমূর্তি ছাড়াও আরো এক ধরনের ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়। একটা বিশেষ ছবি দেখার কিছুক্ষণ পরে একজনকে যদি একটা সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করান

হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়—"কি দেখছো ?" দেখা যায় সে বলে যে সে ঠিক আগের ছবিরই প্রকৃত রূপ দেখছে। এই সব ভাবমূর্তি গুলোর সংগে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন পার্থক্য নেই। এক কথায় বলতে গেলে স্মৃতিগত ভাবমূর্তি আমরা কল্পনা করি কিন্তু এই আইডেটিক ইমেজ আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ ছবি আমরা পর্দার উপর দেখতে পাই যদিও এটা মানসিক ছবি। এটা আমাদের মনে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট। এই ধরনের ভাবমূর্তিকে অনেকে ক্যামেরায় তোলা ছবির সংগে তুলনা করেন। কিন্তু এটা ঠিক তা নয়। সাধারণতঃ ক্যামেরায় ছবির সমস্ত অংশ এক সংগেই ওঠে কিন্তু আইডেটিক ইমেজে ছবির বিভিন্ন অংশ আমাদের চেতনায় ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে।

সাধারণতঃ বয়স্ক লোকদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় না। ছোটদের ক্ষেত্রেই এই ভাবমূর্তি বেশী দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী আলপোর্ট [Allport] বলেন এই আইডেটিক ইমেজ হ'ল প্রকৃত সংবেদন আর প্রকৃত ভাবমূর্তির একটা মাঝামাঝি অভিজ্ঞতা। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রকৃত সংবেদনেরও যেমনি গুণ আছে আবার কিছু কিছু ভাবমূর্তিরও গুণ আছে। বয়স্কেরা এই ভাবমূর্তি আর সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন কিন্তু ছোট ছেলেরা তা পারে না বলেই তারা বেশী আইডেটিক ইমেজ দেখে।

[3] **শাব্দিক ভাবমূর্তি** (Verbal Image) : পরা ভাবমূর্তি আর আইডেটিক ইমেজ ছাড়াও আমাদের মনে আর এক ধরনের ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়। এই সব ভাবমূর্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু ধারণা নেই। এদের আমরা কল্পনাগত ভাবমূর্তির বিশেষ রূপ বলতে পারি। যে বস্তুর এই ধরনের ভাবমূর্তি হয় তাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। যেমন ধর "ভগবান"। ভগবানের কথা শুনলে আমাদের মনে একটা বিশেষ ধরনের ভাবমূর্তি হয়। কিন্তু ভগবানকে আমরা কোন দিন দেখি না। এগুলো আমাদের বিশেষ ধারণা গত ভাবমূর্তি। এ গুলোকে বলা হয় শাব্দিক ভাবমূর্তি। সাধারণতঃ প্রত্যক (Abstract) জিনিসের এই ধরনের ভাবমূর্তি হয়।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের ভাবমূর্তি গঠনে ক্ষমতা
[Individual capacity to form different types of Image]

প্রত্যেক মানুষই ভাবমূর্তি গঠনে সক্ষম। কিন্তু দেখা গেছে সকলের সব রকম ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা এক নয়। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা যেমন গ্যালটন (Galton) এই ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখেন কারো বা ভাবমূর্তি

ভাবমূর্তি
[Image]
অতীত অভিজ্ঞতা জনিত
ভাবমূর্তি
(Image of real exprienCes)
কল্পনার ভাবমূর্তি
(Image of
Imagination)
স্মৃতিগত ভাবমূর্তি
(Memory Image)
সংবেদন গত ভাবমূর্তি
(Sensory Image)
দর্শন ধর্মী
(Visual)
শব্দধর্মী
(Anditory)
স্পর্শধর্মী
(Tactual)
গন্ধধর্মী
(Olfactory)
স্বাদধর্মী
(Gustatory)
বিশেষ ধরনের
ভাবমূর্তি
(Special
types of Image)
আইডেটিক ইমেজ
(Eidetic Image)
পরা ভাবমূর্তি
(After Image)
(a) সদর্থক (Positive)
(b) নঞর্থক (Negative)
শাব্দিক ভাবমূর্তি
(Verbal imag

খুব উজ্জ্বল আবার কারো একেবারে আবছা হয়। এমনও লোক পাওয়া গেছে যারা বলে যে তারা কোন ছবি দেখে না। তিনি এসব দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা আলাদা আছে। অনেককে দেখা যায় তারা যে সব জিনিস দেখে সেই সব জিনিসেরই ভাবমূর্তি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়। তোমরা এরকম অনেক লোক দেখতে পাবে যারা কোন জিনিস নিজে পড়ার পর বেশী মনে রাখতে পারে। আবার অনেকে আছে তাদের নিজে নিজেপড়ে ঠিক হয় না। তাদের যদি কেউ শুনিয়ে দেয় দেখা গেছে তারা বেশী মনে রাখে। এর থেকে বোঝা যায় প্রথম শ্রেণীর লোকদের দর্শন ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা প্রকট আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের শ্রবণ ধর্মী ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা প্রবল। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা এই ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতার দিক থেকে মানুষের একটা শ্রেণী বিভাগ করেছেন। যাদের ভাবমূর্তিতে দর্শন ইন্দ্রিয় প্রধান—তাদের নাম দিয়েছেন চিত্র প্রধান ব্যক্তি (Visile)। আবারযাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় প্রধান তাদের নাম দিয়েছেন ধ্বনি প্রধান ব্যক্তি (Audile)। এমনি করে স্পর্শ প্রধান (Tactile) ইত্যাদি।

কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের এই শ্রেণী বিভাগকে মেনে নেন্ নি; তাদের মত হ'ল—যে ব্যক্তি চিত্র প্রধান যে সে শব্দধর্মী ভাবমূর্তি গঠনে সক্ষম নয় এ কথা বলা যায় না। এদের মতে প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেক রকমের ভাবমূর্তি গঠনে সক্ষম। এই সব রকমেরই ভাবমূর্তি এক সঙ্গে থেকে আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায় সাহায্য করে। এখানে আর একটা জিনিস মনে রাখার দরকার আইডেটিক ইমেজ কিন্তু সকলের হয় না। এ গুলো আইডেটিক ইমেজ ধর্মী (Eidetic type) লোকদেরই হয়। এমন কি চোখ বেঁধে দিলেও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। যেমন দেখা যায় অনেকে চোখ বেঁধে দাবা খেলতে পারে। মনোবিজ্ঞানী থ্যুলেস্ (Thouless) এই দলের লোক ছিলেন।

এ ছাড়াও এক ধরনের লোক দেখা যায় যারা বিশেষ এক ইন্দ্রিয় জাত ভাবমূর্তিকে অন্য ইন্দ্রিয়ের ভাবমূর্তির সংগে মিশিয়ে ফেলেন। যেমন অনেককে দেখবে শব্দকে রং এর সংগে বা অন্য কোন জিনিসের সংগে যুক্ত করে দেন। আমরা যেমন বলি Red hot। কবিদের এই জিনিসটা বেশী হয়। মনের এই প্রবণতাকে মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন সাইনাস্থেসিয়া (Synaesthesia)।

QUESTIONS

1. What is an Image ? Distinguish between Image and Percept. (C. U. 1951)

2. What do you mean by an Image ? Make a broad Classification of them.

3. Distinguish between a Memory image and a Sensory image.

4. What is an After-image ? How their Presence can be demonstrated in the laboratory ?

5. "Memory images are imagined, but Eidetic images are seen"—Explain.

6. Explain the phenomenon of the formation of Mental image and attempt to classify individuals according to their capacity to form different types of images.

Write short notes on :—

(a) Negative and Positive after image (b) Percept (c) Eidetie image (d) Verbal image (e) Audile (f) Visile (g) Synaesthesia.

দ্বিতীয় খণ্ড

(দশম শ্রেণীর পাঠ্য)

প্রত্যক্ষণ

[Perception]

সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থকের কথা প্রথম বলেন টমাস রীড (Thomas Reid)। তার আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষণ আর সংবেদন সম্বন্ধে আলাদা কোন ধারণা ছিল না। 1765 খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বলেন যে যদিও প্রত্যক্ষণ সংবেদন থেকে সৃষ্টি হয় তবুও সংবেদনের থেকে প্রত্যক্ষণ অনেক জটিল প্রক্রিয়া। তাঁর মতে সংবেদন হ'ল শারীরিক একটা ক্রিয়ার ফল মাত্র কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল শারীরিক আর মানসিক উভয় ক্রিয়ারই ফল। সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের পার্থক্য আমরা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো। এখানে প্রত্যক্ষণকে বোঝানোর জন্য যেটুকু দরকার তাই বলছি। প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তুধর্মী জ্ঞান। গোলাপের গন্ধ আজকাল বাজারে নির্যাস বা গুঁড়ো হিসাবে বিক্রি হয়। এখন তোমার নাকে সেই গুঁড়ো গন্ধ এলে গন্ধের সংবেদন হয়। তুমি গন্ধ পেলেই কি সংগে সংগে বলবে এটা একটা গোলাপ ফুল? নিশ্চয়ই না। আবার অন্য কোন ফুলের ওপর যদি গোলাপের গন্ধ দিয়ে তোমার সামনে ধরা হয় তুমি সেটাকে নিশ্চয়ই গোলাপ বলবে না। যদি এমনও করা হয় যে প্রকৃত একটা গোলাপের ওপর অন্য গন্ধ দিয়ে তোমায় দেখালে তুমি সেটাকে অন্য কোন ফুল বলে ভুল কর না। তবে এ রকম কি করে হ'চ্ছে?—তোমার গন্ধের সংবেদন হ'চ্ছে। আবার ফুলের বিভিন্ন অংশ থেকে দর্শন-গত সংবেদন হ'চ্ছে। তার ওপরেও আছে তোমার অতীত অভিজ্ঞতা। এইসব গুলো তোমার মস্তিষ্কে গিয়ে একটা একক এবং ঠিক বস্তুধর্মী অনুভূতিতে সাহায্য করছে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষণ (Perception)। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন উত্তেজনার উৎস সম্বন্ধে যে জ্ঞান (Knowledge) তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ। রাস্তায় কোন বন্ধু তোমাকে ডাকলে তোমার শব্দের সংবেদন হয়, আর তুমি তার দিকে তাকাও। এখন তাকে দেখে বা পূর্ব পরিচিতির জন্য বুঝতে পার যে এটা তোমার বিশেষ কোন বন্ধুর কণ্ঠস্বর। যখন তুমি এটা বুঝতে পার তখন ঐ শব্দটা আর নিছক সংবেদন থাকে না—ওটা হয় শব্দের প্রত্যক্ষণ। প্রথম যখন শব্দ তোমার কানে গিয়েছিল তখন ওটা মস্তিষ্কে একটা সংবেদনেরই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর সংগে যোগ দেওয়ার ফলে এই সংবেদন জটিল

হয়ে আমাদের একটা অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিচ্ছে। সুতরাং প্রত্যক্ষণকে আমরা সংবেদন উদ্ভূত অভিজ্ঞতা বলতে পারি। প্রত্যেক প্রকার সংবেদনের সংগে এক রকম করে প্রত্যক্ষণ আছে। তাদের আমরা এই ভাবে নামকরণ করতে পারি—দর্শন জনিত প্রত্যক্ষণ (Visual perception), শ্রবণ জনিত প্রত্যক্ষণ (Auditory perception) স্পর্শ জনিত প্রত্যক্ষণ (Tactual perception) স্বাদ জনিত প্রত্যক্ষণ (Gustatory perception) আর গন্ধের প্রত্যক্ষণ (Perception of smell)।

সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে তুলনা (Comparison between Sensation and perception) :—

সংবেদন (Sensation)	**প্রত্যক্ষণ** (Perception)
1. সংবেদন শুধুমাত্র বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান।	1. প্রত্যক্ষণ হ'ল সংবেদন এবং সংবেদনের বিশ্লেষণ উদ্ভূত জ্ঞান।
2. সংবেদন হ'ল জ্ঞান আহরণের যোগানী মাত্র—জ্ঞান নয়।	2. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল প্রকৃত জ্ঞান।
3. কোন বস্তু যখন সংবেদনের সৃষ্টি করে তখন তার সংগে আমাদের মনের যোগাযোগ হয় মাত্র। আর এই যোগাযোগ হয় শরীরের মাধ্যমে। এদিক থেকে সংবেদনকে আমরা জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে পারি।	3. এই সংবেদনের সাহায্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হ'লেই পরে আমাদের প্রত্যক্ষণ হয়, এবং আমরা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করি।
4. সংবেদনগুলো বিচ্ছিন্ন (Isolated)। কোন বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সংবেদনের সৃষ্টি করে। এদিক থেকে সংবেদন আমাদের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা।	4. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তু সম্বন্ধে একক অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন গুণাবলী বিচার করে বস্তু সম্বন্ধে যখন একক ধারণা জন্মায় তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ।
5. সংবেদন উত্তেজক প্রবুদ্ধ	5. কিন্তু প্রত্যক্ষণ বিশ্বাস উদ্ভূত।
6. সুতরাং সংবেদনে আমাদের মন নিষ্ক্রিয় থাকে।	6. প্রত্যক্ষণ, সংবেদন বিশ্লিষ্ট। সুতরাং এখানে মন সক্রিয় থাকে।
7. সংবেদনে বস্তুর উপস্থাপন (Presentation) হয় মাত্র।	7. কিন্তু প্রত্যক্ষণে বস্তুর উপস্থাপন ও উত্থাপন (Representation) দুই হয়।
8. সুতরাং সংবেদন হ'ল প্রত্যক্ষণের একটা হেতু (Condition)।	8. প্রত্যক্ষণ হ'ল একটা মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process।

আমরা কি প্রত্যক্ষ করি [What we perceive] ?

এখন প্রশ্ন হ'ল আমরা কি প্রত্যক্ষ করি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমাদের বস্তু সম্বন্ধে কি জ্ঞান হয় ? এখানে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আমরা জানি প্রত্যক্ষণের ভিতর অবগতি (Cognition) আর প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) দুই রকমই প্রক্রিয়া কাজ করে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমরা বস্তুর অস্তিত্ব আর তার বিশেষত্ব এই দুই সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করি। অস্তিত্ব উপলব্ধি আমাদের শুধুমাত্র সংবেদন থেকে হ'তে পারে কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে উপলব্ধি প্রত্যক্ষণ ছাড়া হ'তে পারে না। ধর, কোন ফুল আমরা দেখছি। তার কি কি বিশেষত্ব আমরা দেখ্‌তে পারি—রং দেখলাম ওটা নীল। এখন দেখবো কতটা নীল। খুব ঘোর নীল না আবছা নীল। অর্থাৎ এই দুই পর্যায়ে আমরা বস্তুর দুটো বিশেষত্ব দেখ্‌ছি। একটা হ'ল গুণ (Quality)। আর একটা হ'ল সেই গুণের পরিমাণ (Quantity) বা তীব্রতা (Intensity)। এখন দেখবো ফুলটা কত বড়, এটা হ'ল বস্তুর ব্যাপ্তি (extensity)। বস্তুর এই সব গুণ গুলো প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পর আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসি এবং তখন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ঐ ফুলের একটা নামকরণ করি। তাহ'লে আমরা বলতে পারি বস্তুর [1] গুণ (Quality) [2] তীব্রতা (Intensity) আর [3] স্থানব্যাপ্তি (Extensity) এই সব বিশেষত্বগুলো দেখি। এছাড়াও আর একটা জিনিস দেখি সেটা হ'ল বিষয় বস্তুর [4] কালব্যাপ্তি (Duration)। কতক্ষণ বস্তুটা আমাদের সামনে আছে ? এর থেকে আমরা বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এই চারটে বিশেষত্বের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আলোচনা করবো।

[1] **গুণ** (Quality) : কোন বস্তুর গুণ আমরা দুই দিক থেকে বিচার করতে পারি। ফুল আমরা চোখে দেখি আর নাকে গন্ধ শুঁকি। আবার শব্দ আমরা কানে শুনি। অর্থাৎ যে জিনিস আমরা চোখে দেখি আর যে জিনিস আমরা কানে শুনি, সে দুটোর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। সুতরাং প্রত্যক্ষণের সময় চোখ দিয়ে যা দেখ্‌ছি—তা মনে একধরনের ধারণা দেবে, আবার কান দিয়ে যা শুন্‌ছি তা একধরনের ধারণা দেবে আমাদের। এই যে ইন্দ্রিয়গত পার্থক্যের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর বিভিন্ন গুণগত বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পারছি একে বলা হয় জাতীয় প্রভেদ (Generic difference)।

এ ছাড়াও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে। সেটা হ'ল প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য। যেমন, চোখ দিয়ে আমরা লাল,

নীল সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি। আবার কান দিয়ে আমরা গান বা গণ্ডগোল দুই শুনতে পাই। জিহ্বার দ্বারা তেতো আর মিষ্টি দুই স্বাদই পাই। এই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই গুণগত পার্থক্য দেয় একে বলে বিশিষ্ট পার্থক্য (Specific difference)। আমরা প্রত্যক্ষণে বস্তুর এই দুই রকমের গুণই উপলব্ধি করি।

[2] **তীব্রতা** (Intensity) : তীব্রতা বলতে আমরা সাধারণতঃ গুণের তীব্রতা বুঝবো। একটা শব্দ খুব জোর আবার একটা শব্দ খুব আস্তে। একটা জিনিস খুব লাল আর একটা ফিকে লাল। কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির জন্য আমরা তার গুণের তীব্রতা পরীক্ষা করি। আসলে এটা কিন্তু বস্তুর গুণগত বিশিষ্ট পার্থক্যের (Specific difference) আরো বেশী বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পলাশ আর জবা ফুলের মধ্যে কি পার্থক্য।

[3] **স্থানব্যাপ্তি** (Extensity) : আমরা কোন জিনিসকে ছোট দেখি আবার কোন জিনিসকে বড় দেখি। কোন কিছু আমাদের শরীরে স্পর্শ করলে বুঝতে পারি সেটা কত বড় জিনিস। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর এই যে বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করি একে বলা হয় তার স্থানব্যাপ্তি (Extensity)। এটা নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের ওপর উত্তেজিত জায়গার পরিমাণের উপর। কোন জিনিসের স্থানব্যাপ্তি বোঝার জন্য আমাদের বিস্তৃত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য স্থানব্যাপ্তির বেশীর ভাগ আমরা বুঝতে পারি চোখ আর ত্বকের সাহায্যে। ত্বকের যতটা জায়গা উত্তেজকের সাহায্যে উত্তেজিত হয় ততটা জায়গার অনুভূতি আমরা পাই। আরো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে আমাদের ত্বকের বা চোখের পর্দার (Retina) ওপর প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি বিশেষ গুণ আছে যার দ্বারা তারা কোন বিস্তৃত (extended) উত্তেজকের প্রত্যেক বিন্দুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের দেয়। এই বিশেষত্বকে বলা হয় স্থানীয় সংকেত (Local sign)। ইন্দ্রিয়ের উপর সহ-অবস্থান কারি (Co existing) যতগুলি বিন্দু উত্তেজিত হয় তার উপর বিষয় বস্তুর বিস্তৃতি নির্ভর করে। এর ফলে আমরা জিনিসকে ছোট বড় দেখি। আবার ঐ স্থানীয় সংকেতের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন উত্তেজনার স্থান উপলব্ধি করতে পারি। এটা হল আমাদের প্রত্যক্ষণের বা স্থানীয় সংকেতের পৃথকীকরণ ক্ষমতা।

[4] **কালব্যাপ্তি** (Duration) : আমরা বুঝতে পারি আমাদের চোখের সামনে কতক্ষণ বিদ্যুতের ঝলক ছিল। কতক্ষণ আমাদের কানে সেই মিষ্টি সুরটা এসেছিল। এই যে উত্তেজকের উত্থাপন কাল সম্বন্ধে জ্ঞান এটাকে আমরা সময়ের প্রত্যক্ষণের

(Perception of time) একটা দিক বলতে পারি। আমরা যে বর্তমানকে উপলব্ধি করি তার পেছনে আরো দু'রকমের জ্ঞান কাজ করে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ। যেমন বিদ্যুৎ চমকালে কতক্ষণ আলো জ্বলে তা আমরা আন্দাজ করতে পারি এর পেছনে অতীত এবং পরের আলোহীন অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে। এই দুটো মিলেই আমাদের সময়ের প্রত্যক্ষণ বা উত্তেজকের কালব্যাপ্তি (Duration) সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই সময়ের প্রত্যক্ষণ মনোবিজ্ঞানে আর একটা বিশেষ আলোচনার বিষয়।

প্রত্যক্ষণের সংঘবদ্ধতা
(Organisation in Perception)

প্রত্যক্ষণ যে একটা একক অভিজ্ঞতা তা সমগ্রতা বাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Gestaltist) বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন। আগে ধারণা ছিল আমাদের প্রত্যক্ষণ কতকগুলো সংবেদনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ মিশ্র সংবেদন। কিন্তু সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের প্রথম প্রতিবাদ করেন। তারা ব'ললেন প্রত্যক্ষণ আমাদের একক অনুভূতি। প্রত্যক্ষণ যদি বিভিন্ন সংবেদনেরই মিশ্রণ হবে, তাহ'লে একটা জিনিস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উত্তেজনা গুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করি তাহ'লে তাদের সংবেদনগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মিশে বিশেষ বস্তুর জ্ঞান দেওয়া উচিত অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষণ হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম হয় না। আবার অনেক সময় দেখা যায় সম্পূর্ণ জিনিস না থাকলেও আমাদের প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন—একটা ত্রিভুজের একটা দিক যদি ফাঁক রেখে কাউকে জিজ্ঞেস করি "এটা কি ?" সংগে সংগে উত্তর পাব 'ত্রিভুজ'। এই সব কারণে সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রত্যক্ষণের একটা বিশেষ গুণ আছে। সেটা হ'ল এই যে—প্রত্যক্ষণ সব সময় সুসংবদ্ধ (Organised)। তারা আরও বলেন যে মনের একটা বিশেষ গতীয় গুণ (Dynamical property) আছে যার দ্বারা আমরা একটা একক এবং সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তারা মনের এই গতীয় গুণের অস্তিত্বকে বহু উদাহরণ এবং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। সে তোমরা আরো বেশী পড়লে জানবে। এখন প্রত্যক্ষণে যে আমরা সুসংবদ্ধ একক অভিজ্ঞতা পাই তার অনেক গুলো কারণ আছে। তার কতকগুলো হ'ল—(1) উত্তেজক গত আর কতকগুলো হ'ল—(2) মনোগত। এখন আমরা এদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রবো।

(1) উত্তেজকগত কারণ [Physical causes] : আমরা কোন বিষয়

গভীরতা আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণ

(Perception of Distance & Depth)

চোখের গঠন বর্ণনা থেকে আমরা জেনেছি, যে কোন বস্তুর ছবি আমাদের অক্ষিপটে (Retina) এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই। এই পর্দাটা একটা বিস্তৃত জিনিস। এর দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে। তাহ'লে এতে যে সব ছবি পড়বে তার শুধু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ উপলব্ধি করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের সামনে যদি, একটা বাক্স থাকে, তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে পড়তে পারে। এর ফলে আমরা একটা আয়তক্ষেত্রের মত জিনিস দেখতে পারি। কিন্তু তা হয় না। আমরা বাক্সটার আর একটা দিকও দেখতে পাই সেটা হ'ল উচ্চতা বোধ বা গভীরতা (Depth)। এ জিনিসটা আমাদের সিনেমা দেখার সময়ও হয়। পর্দার উপরে কতকগুলো ছায়া এসে পড়ে, কিন্তু আমরা দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো তারো পেছনে ঘর আছে। আবার ড্রয়িং এও ঠিক একই জিনিস হয়। একটা কাগজের উপর কয়েকটা সোজা আর বাঁকা লাইন টেনে আমরা দেখতে পাই একটা কাপ প্লেট। এই সব গুলো কি করে ঘটে তার কারণ আবিষ্কারের জন্য বহু দার্শনিক শিল্পী, আর মনোবিজ্ঞানী বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছেন। 1709 খৃষ্টাব্দে দার্শনিক বার্কলে (Berkeley) প্রথম বলেন যে আমাদের দূরত্বের বা গভীরতার জ্ঞান শুধু মাত্র দৃষ্টি শক্তি থেকে আসতে পারে না। এর পেছনে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করে। আগেকার যুগে মনোবিদ্‌রা মনে করতেন যে আমাদের দূরত্ব বা গভীরতা জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতা (Experience) আর বিচারের (Judgement) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মন বাইরের জগত সম্বন্ধে বিচার করে জ্ঞান লাভ করে। তাহ'লে আমরা এ কথা বলতে পারি সংবেদন থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতাকে আমরা বিচার করে তবে দূরত্ব অথবা গভীরতার জ্ঞান পাই। হেলমোজ (Helmholtz) বলেন যে, এই যে আমরা সংবেদনকে বিচার করি সেটা অবচেতন মনে করি। এখন আমরা বলতে পারি দু'টো বিশেষ জিনিস আমাদের এই দূরত্ব আর গভীরতার প্রত্যক্ষণে সাহায্য করছে। একটা হ'ল সংবেদন আর একটা অবচেতন মনের অতীত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ আমাদের এই প্রত্যক্ষণের পেছনে কতকগুলো কারণ আছে যে গুলোর জন্য আমাদের সংবেদন বা উত্তেজক দায়ী আর কতকগুলো আছে যার জন্য আমাদের মনের অভিজ্ঞতা দায়ী। এদের মধ্যে প্রথম কারণগুলোকে বলা হয় মুখ্য কারণ (Primary Causes) আর শেষের গুলোকে বলা হয় গৌণ কারণ (Secondary

Causes)। এখন আমরা এই সব কারণগুলো সম্বন্ধে এক এক করে আলোচনা করবো এবং কি ভাবে তারা আমাদের দূরত্ব এবং গভীরতার জ্ঞানে সাহায্য করছে তাও বলবো।

মুখ্য কারণ [Primary Causes]

মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে ঊনিশ শতকের মধ্যে দূরত্ব আর গভীরতার কারণ হিসাবে তিনটে জিনিস আবিষ্কৃত হয়। সে গুলো হ'ল :—

(a) **চোখের কেন্দ্রাভিমুখীতা** [The Convergence of the eyes] : কোন জিনিস দেখতে হ'লে আমরা তার দিকে তাকাই, এবং দুটো চোখেই দেখি। দু'টো চোখের পর্দাতেই জিনিসটার ছবি পড়ে এবং প্রায় একই জায়গাতেই পড়ে। এখন কোন জিনিসকে দেখতে হ'লে আমাদের চোখ দুটোকে নেড়ে চেড়ে এমন ভাবে ঠিক করতে হয় যাতে জিনিসটার ছবি দুটো চোখের একই জায়গায় পড়ে। একে বলে চোখের কেন্দ্রাভিমুখীতা। অর্থাৎ আমাদের দুটো চোখ এখানে বস্তুকে কেন্দ্র করে থাকে। এখন বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর জন্য আমাদের চোখ দুটো বিভিন্ন ভাবে নাড়া চাড়া করতে হয়। এর ফলে চক্ষু পেশীতে বিভিন্ন রকমের সংবেদন হওয়ার জন্য দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হয়। বেশী দূরত্বে চোখকে কম কেন্দ্রাভিমুখ হতে হয় আর কম দূরত্বে ঠিক উল্টো হয়।

(b) **দৃষ্ট বস্তুকে ফোকাসে আনার জন্য চোখকে উপযোগী করা** [Accomodation]ঃ কোন বস্তুকে ঠিক ভাবে দেখতে হ'লে সে বস্তুর ছায়া যাতে আমাদের অক্ষিপটের (Retina) ওপর পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমরা জানি কোন বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে আমাদের চোখের জৈবিক লেন্সের (Eye Lens) উপর পড়ে তারপর সেখান থেকে প্রতিসৃত হয়ে অক্ষিপটে গিয়ে মিলিত হয় তবেই আমরা দেখি। এখন যাতে অক্ষিপটে ছায়া পড়ে তার জন্য লেন্সের (Lens) ঘনত্বটা (Thickness) বাড়াতে কমাতে হয়। এই বাড়ানো কমানো হয় কতকগুলো পেশীর দ্বারা সে তোমরা আগেই পড়েছ। এখন বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী এই পেশীগুলো নানা রকমের ভাবে সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে লেন্সের (Lens) ঘনত্ব (Thicsness) বাড়ায় বা কমায়। একেই বলে Accomodation। দ্রষ্টব্য জিনিস যদি অনেক দূরে থাকে তা হ'লে এই পেশীগুলো আল্‌গা হয় আর যদি কাছে থাকে তাহ'লে টান পড়ে। এর ফলে আমাদের মস্তিষ্কে যে অনুভূতি হয় সেটাই আমাদের বস্তুর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

এখন মনে রাখতে হ'বে কোন জিনিস দেখতে হ'লে আমাদের চোখকে Acco-

modation আর Convergence এ দুটো কাজই করতে হ'বে। তাই দুটোকে আলাদা ভাবা যায় না। তবে মনোবিজ্ঞানী Wundt বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করার পর এ মতবাদ প্রকাশ করেন যে আমাদের দূরত্বের বা গভীরতার প্রত্যক্ষণের জন্য Convergence টাই বেশী প্রয়োজনীয়।

(c) **দুটো অক্ষি পটের ছবির মধ্যে পার্থক্য** (Retinal disparity):—আমাদের চোখ দুটো আমাদের মাথার ওপর প্রায় ৬০—৭০ মিলিমিটার দূরে অবস্থিত। একটি চোখের অক্ষিপটে বস্তুটির যে ছবি পড়ে অপরটিতে ঠিক সেই ছবি পড়ে না। কোন বস্তু দেখতে হলে বাম চোখ দিয়ে বস্তুর ডান দিকটা যতটা দেখছি ডান চোখ দিয়ে তার থেকে একটু বেশী দেখি। বাম চোখে আবার বস্তুর বেশীর ভাগ বাম দিকটা দেখি। এই যে একই বস্তুকে দুটো চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একে বলা হয় অক্ষিপটের ছবির পার্থক্য (Retinal disparity)। দুটো চোখে দুরকম দেখলেও কিন্তু আমরা একই বস্তু দেখছি এবং এরই ফলে আমরা বস্তুটির ঘনত্ব বুঝতে পারছি। দুটো বিভিন্ন ছবি একসঙ্গে মিশে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ জ্ঞান দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে গভীরতার। কিভাবে এটা ঘটছে সেটা তোমরা পরে আরও বিশদ ভাবে পড়বে।

এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস্ (Oliver & Wendell Holmes) 1761 খ্রীষ্টাব্দে ষ্টেরিওস্কোপ নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে আমরা দুটো একই বস্তুর ছবি দুটো প্রিজ্মের মধ্য দিয়ে দেখি। যে ছবিটা
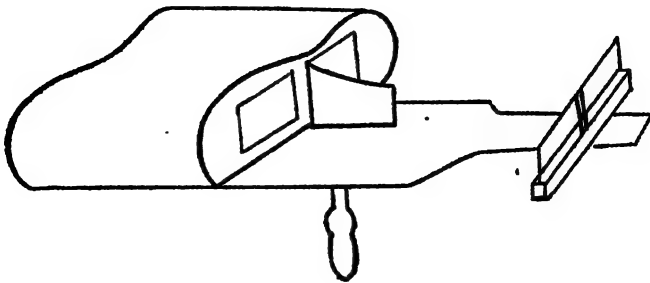
স্টেরিওস্কোপ (Sterescope)

ডান চোখ দিয়ে দেখি সেটা শুধু ঐ চোখ দিয়ে যেভাবে বস্তুটাকে দেখা যায় ঠিক সেই ভাবে ছবিটা আঁকা বা তোলা হ'য়েছে আর বাম চোখের দিকের ছবিটা বাম চোখের দেখা অনুযায়ী তোলা হ'য়েছে। এখন এই দুটো ছবির মধ্যে 60—70 মিলি-

মিটার দূরত্ব রেখে প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে দেখা হয়। যাতে দুটো ছবির ছায়া আমাদের দুটো চোখের অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে পড়ে তারজন্য প্রিজ্‌ম ও ছবি দুটির মধ্যে দূরত্ব ঠিক করে নিতে হয় প্রিজমদুটিকে নাড়াচাড়া করে। এভাবে দেখলে আমরা তখন দুটো চোখে একটাই বস্তু দেখি কিন্তু বস্তুর গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হয়।

[2] **গৌণ কারণ** (Sucondary causes) : আমাদের দূরত্ব আর গভীরতা প্রত্যক্ষণের গৌণ কারণ হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা যেগুলোকে ধরেছেন সেগুলো হ'ল :—

(a) একটির ওপর আর একটির স্থিতি (Superposition) : ছোট বেলা থেকে আমরা শিখেছি যে একটা জিনিসকে আর একটা জিনিস আড়াল করলে যেটা আড়াল করছে সেটা কাছে আছে। সুতরাং একটার ওপর আর একটার অবস্থিতি থেকে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি।

(b) বস্তুর আকার (Size) : আমরা জানি দূরের জিনিসকে ছোট এবং কাছের জিনিসকে বড় দেখায়। এইধারণা আমাদের দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। শিল্পীরা যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁরা বস্তুর আকার ছোট বড় করে দূরত্ব বোঝাতে চান।

(c) আলো আর ছায়া (Light & Shade) : আমরা জানি নীচু জায়গার চেয়ে উঁচু জায়গায় আলো বেশী পড়ে। তাই শিল্পীরা উঁচু জায়গা বোঝানোর জন্য বেশী সাদা রাখেন এবং নীচু জায়গা কালো রাখেন। এই আলো আর ছায়া আমাদের গভীরতা প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

(d) প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাহায্যে (Aerial Perspective) : প্রকৃতির সাহায্যে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। দূরের জিনিসগুলোকে কাছের জিনিসের চেয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত আবছা দেখি। তাই দুটো জিনিসের মধ্যে যেটা বেশী আবছা সেটাকে আমরা দূরের ভাবি।

(e) ফাঁকা আর ভর্তি জায়গা Filled and Empty space) : কোন ফাঁকা জায়গার চেয়ে ভর্তি জায়গার দূরত্ব সবসময় বেশী মনে হয়। দুটো ছবি এঁকে একটাকে কালি দিয়ে ভর্তি করে দিলে দেখবে সেটা বেশী দূরের মনে হচ্ছে। তাই এটা দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

গভীরতা আর দূরত্ব প্রত্যক্ষণের যে কারণগুলো বল্‌লাম এদের মধ্যে কোনগুলো বেশী প্রয়োজনীয় এনিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বেশার ভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেকগুলো বর্তমান থেকে আমাদের প্রত্যক্ষণ

ঘটায়। বার্কলে যখন প্রথম দূরত্ব এবং গভীরতা সম্বন্ধে তার মতামত প্রকাশ করেন তার পর থেকে বেশ কিছুদিন ধারণা ছিল যে এই ধরনের প্রত্যক্ষণের জন্য একমাত্র মুখ্য কারণ (Primary causes) গুলোই দায়ী। অর্থাৎ শুধুমাত্র শারীরিক কারণ গুলোই আমাদের গভীরতা আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। কিন্তু বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আসলে আমরা যাদের গৌণ কারণ বলে বল্‌লাম, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা গুলোই হ'ল মূল কারণ। এই সব অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র চোখ নাড়াচাড়া থেকে আমাদের গভীরতা বা দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হ'তে পারে না। তার আগেই আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞার দরকার। তাই শেষোক্ত কারণগুলোকে মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষণের প্রাথমিক স্বয়ং ক্রিয় কৌশল (Primary dynamical mechanism of perception)।

অধ্যাস (Illusion) ও অমূলক প্রত্যক্ষণ (Hallucination)

এতক্ষণ তোমাদের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে বললাম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই প্রত্যক্ষণ অনেক সময় বিকৃত হয়। বিকৃত প্রত্যক্ষণ দু রকম হয়—অধ্যাস (Illusion) ও অমূলক প্রত্যক্ষণ (Hallucination)।

অধ্যাস (Illusion)

রাত্রিবেলা আবছা চাঁদের আলোতে চলতে চলতে হঠাৎ পথের পাশে একটা সাপ দেখে চমকে উঠলে—কিন্তু তারপর যখন একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে তখন বুঝতে পারলে যে ওটা মোটেই সাপ নয়, ওটা একটা দড়ি পথের পাশে পড়ে রয়েছে। এখানে প্রথমে ভুল প্রত্যক্ষণ হ'য়েছিল। একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন আকারের দুটো বোতল নিয়ে যদি পর পর তোল দেখবে যে আকারে যেটা বড় সেটা বেশী ভারী মনে হচ্ছে। আবার যদি একই হাতের পাশাপাশি দুটো আঙ্গুলের একটাকে আর একটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে চাপিয়ে দুটো আঙ্গুলের ডগার মাঝখানে একটা গুলি ধর তাহ'লে দুটো আঙ্গুলে দুটো গুলির অনুভূতি পাবে। এখানে প্রত্যক্ষণ বিকৃত হ'চ্ছে। যদি প্রকৃত প্রত্যক্ষণ হতো তাহ'লে আমরা দুটো বোতলের ওজন একই বলে বুঝতে পারতাম এবং একটা গুলি আছে বলে বুঝতাম। এই সব বিকৃত প্রত্যক্ষণ গুলোকে বলে অধ্যাস বা Illusion। এই অধ্যাসের মূল কথা হ'ল এই যে এখানে সংবেদনের কোন ভুল হয় না। ভুল যেটা হয় সেটা প্রত্যক্ষণের তাহ'লে অধ্যাস তখনই হয় যখন কোন উত্তেজক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়। মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যায় তাকেও আমরা অধ্যাস বলি। কিন্তু এসব অধ্যাসের সঙ্গে

আলোক রশ্মির ধর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এসব ভ্রমের কথা আমরা এখানে আলোচনা করব না। এখানে আমরা সেই সব অধ্যাসের কথা আলোচনা করব যাদের উৎপত্তি হয় মনের প্রবণতা থেকে। অবশ্য একটা কথা বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভ্রম বা অধ্যাস বলে কিছু কথা মনোবিজ্ঞানে থাকতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের কিছু না কিছু বিকৃত জ্ঞান দেয়। সত্যি যে জিনিস আমাদের উত্তেজিত করছে প্রত্যক্ষণ হ'লে কিন্তু তার রূপের পরিবর্তন হয়। গভীরতার অনুভূতি, পশ্চাদ্‌মূর্তি এ সব অভিজ্ঞতাগুলো সবই ভ্রমের ভিতর পড়ে। এ সব কারণ সত্ত্বেও অনেক মনোবিজ্ঞানীরা এই অধ্যাসের আলোচনা প্রত্যক্ষণ থেকে আলাদা ভাবে করেছেন। সেই সব আলোচনাগুলোর কথা আমরা এখানে বলবো।

প্রত্যক্ষণ বিকৃত হওয়ার মূলে যে সব কারণগুলো আছে সেগুলো অনুযায়ী আমরা অধ্যাসকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি।—

(1) আমরা যে ভুল জিনিসটা দেখি সেটা যদি আসল জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী পরিচিত হয় তাহ'লে আমাদের বিকৃত প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন হয়—যারা ছাপাখানার ভুল সংশোধন করে তাদের। ধর কম্পোজিটর অর্থাৎ যে অক্ষরগুলি সাজায় সে ভুল করে সাজিয়েছে "দঁড়াইয়া"। আর সংশোধনকারী পড়ে গেল "দাঁড়াইয়া"। ভুল সংশোধন করা হ'ল না। এটা হয় তার কারণ "দাঁড়াইয়া" এই কথাটি আমাদের বেশী পরিচিত। তাই আমাদের চোখের দ্বারা "দঁড়াইয়া" এই সংবেদন হলেও আমরা "দাঁড়াইয়া" এই কথাটাই প্রত্যক্ষ করি। এক কথায় আমরা বলতে পারি মিথ্যা জিনিসটি সত্য জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী পরিচিত বলে আমাদের মনের প্রবণতা মিথ্যা জিনিসের ওপর আসে।

(2) আগে যে ভ্রমের কথা বললাম তা' হল বস্তুধর্মী। কিন্তু অনেক ভ্রমের জন্য আমাদের মানসিক অবস্থা দায়ী। যেমন অনেকদিন তোমার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়নি, ভাবছো এলে বেশ হয়। হঠাৎ তারই মতন একজনকে রাস্তায় দেখে সেই বন্ধু ভেবে হঠাৎ ডেকে উঠলে। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পাও। তোমার কালো রং-এর একটা কলম স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় হারিয়ে গেল। আবার বাড়ী থেকে খুঁজতে বেরোলে রাস্তায়। দূরে একটা কালো জিনিস দেখে তোমার হারানো কলমের কথা ভেবে তুমি খুশী মনে ছুটে কাছে গিয়ে দেখলে যে সেটা একটা কালো কাঠি মাত্র। এই সব ভ্রমগুলোর কারণ হ'ল আমাদের মানসিক ইচ্ছা।

(3) এ ছাড়া আর এক ধরনের অধ্যাস সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন সেটা হ'ল জ্যামিতি অধ্যাস (Geometrical Illusion)। আমরা সাধারণতঃ সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে চাই না। তাই যখন কোন ছবি দেখি তখন সব সময় তার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখি না। ফলে ছবির সমস্তটা মিলে আমাদের মনে একটা একক 'অভিজ্ঞতা আসে। এর জন্য অনেক জিনিসের আমাদের ভুল প্রত্যক্ষণ হয়। আবার এও বলা যায় যে ছবির একটা অংশ আর একটা অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমাদের ভ্রম ঘটায়। এই রকম জ্যামিতিক ভ্রম আমাদের বহু ঘ'টে থাকে। নীচে তার মধ্যে কতকগুলো ভ্রমের কথা আলোচনা করা হ'ল :—

[a] এখানে একটা আয়তক্ষেত্রের ফাঁকা জায়গাটা বাদ দিয়ে কোণা করে একটা সোজা রেখা টানা আছে। অর্থাৎ ছবির দুটো বিচ্ছিন্ন রেখা একই সরল-

পেগেনডর্ফের ছবি
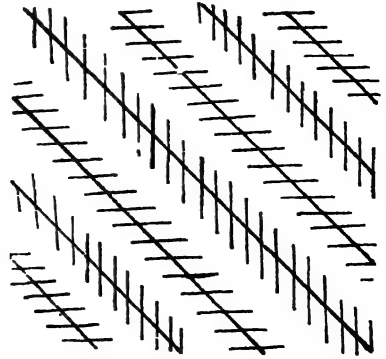
জোলনারের ছবি

রেখার অংশ। কিন্তু আমরা দুটো আলাদা রেখাই প্রত্যক্ষ করছি যার একটা ওপরে ও আর একটা নীচে। এটার নাম হল পেগেনডরফ্ (Peggendorff) এর ছবি। এরই আর একরকম ধরন হ'ল জোলনার ছবি (Zollner)। এতে সোজা রেখাগুলি সব সমান্তরাল কিন্তু বাঁকা রেখাগুলো থাকার জন্য এগুলোকে সমান্তরাল রেখা বলে বোঝা যাচ্ছে না।
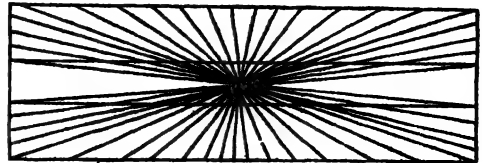
হেরিং এর ছবি

(b) জোলনারের ছবির

মতই হেরিং (Herring) ও ভুণ্ড (Wundt) এর ছবি। এখানে দুটো সমান্তরাল রেখা অন্য কতকগুলি রেখা থাকার জন্য বাঁকা দেখা যায়।

(c) সেনডোর এই রকম রেখার আর এক রকম ভ্রম দেখান। একে বলা হয় সামান্তরিক ভ্রম। যেমন পাশের ছবিতে AF ও FC সমান কিন্তু সামান্তরিক দুটোর ভূমিরেখার তফাতের জন্য একটা কর্ণকে আমরা ছোট ও অপরটাকে বড় দেখছি।
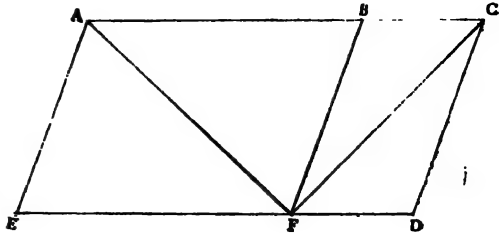
সেন্ডোর ছবি (Sendor's figure)

[d] এই সব জ্যামিতিক ভ্রমগুলো ছাড়া যে ভ্রম সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানে বেশী আলোচনা হ'য়েছে সেটা হ'ল মূলার লায়ার-এর ভ্রম। (Muller Leyer Illusion) এখানে দেখানো হ'চ্ছে একই লাইনের উপর বিভিন্ন রেখার সমন্বয় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের মনে ভ্রম সৃষ্টি করে। যেমন প্রথম ছবিতে দেখানো হ'চ্ছে একই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটো
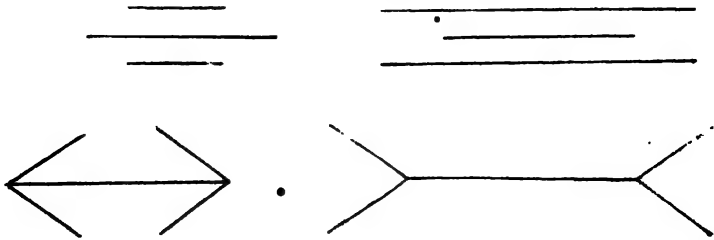
মূলার ল্যায়ারের ভ্রম (Muller Leyer's illusion)

রেখার শেষ প্রান্তে দুরকম ভাবে দাগ টানা হ'য়েছে। একটায় তীরের ফলার মত দাগ আর একটায় পালকের মতন। এর প্রথমটাকে ছোট এবং দ্বিতীয়টাকে বড় দেখাচ্ছে। আবার দ্বিতীয় ছবিতে সমান দুটো রেখার দুপাশে দুটো করে রেখা টানা হ'য়েছে। একটার দুপাশের রেখা ছোট এবং অপরটার বেশ বড়। তার জন্য সমান দুটো রেখাকে আমাদের অসমান বলে ভ্রম হ'চ্ছে।

এই সব ভ্রমগুলো সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন এই সব জ্যামিতিক ভ্রমগুলো আমাদের চোখ নাড়াচাড়া (Eye move-

ment) করার জন্য হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে এটা আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic Sense) ক্ষমতা থেকে উৎপত্তি হয়। তবে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সমস্ত জিনিসকে একসংগে দেখে তার থেকে একক অনুভূতি পাওয়াই হ'ল আমাদের মনের অথবা প্রত্যক্ষণের ধর্ম। আর সেই কারণে আমরা প্রত্যেক ছবির বিশেষ বিশেষ অংশ না দেখে সম্পূর্ণটা থেকে একটা অভিজ্ঞতা পাওয়ার চেষ্টা করি। ফলে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। এ সব কারণ সম্বন্ধে তোমাদের বিশদভাবে কিছু জানার দরকার নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখলেই চল্‌বে যে এটা আমাদের মনের একটা বিশেষ অবস্থা উদ্ভূত। অধ্যাস সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাক্‌বে, রাস্তায় একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হওয়ার পর যখন আবার দূরে সরে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে নিজের ভুল বুঝতে পার তখন আর দড়িকে সাপ দেখ না, দড়িই দেখ। এটা হ'ল ভ্রমের একটা ধর্ম, এটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই ভ্রম আমাদের ঠিক হয়ে যায়।

[2] **অমূলক প্রত্যক্ষণ** (Hallucination) : তোমরা হয়তো কারো কাছে শুনে থাকবে যে সে রাতে ভূত দেখেছে। এ ঘটনা অমূলক প্রত্যক্ষণের (Hallucination) উদাহরণ। আসলে আমরা এই অমূলক প্রত্যক্ষণকে ভুল প্রত্যক্ষণের মধ্যে ফেলতে পারি না। তাই এর সম্বন্ধে আলোচনা এখানে একেবারে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু পাঠ্যসূচীর ভিতর এই অমূলক প্রত্যক্ষণকে এই পর্যায়ে ফেলা হ'য়েছে। তাই এর সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করব। এই সব অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা প্রত্যক্ষণ বা ভুল প্রত্যক্ষণ বলতে পারি না তার কারণ প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাস উভয়ের জন্যই একটা উত্তেজক দরকার হয়। কিন্তু অমূলক প্রত্যক্ষে তা থাকে না। আসলে ভূতের কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং এই সব অনুভূতির সময় ভূতের মতন কোন জিনিস আমাদের সামনে থাকে না। এই সব অভিজ্ঞতার উৎস একেবারে মন। স্নায়বিক উপাদানগুলোর বিকার ঘট্‌লে আমাদের এরকম মানসিক বিকার হয়। ষ্টাউট বলেন এটা আমাদের মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহের পরিমাণগত পরিবর্তনের জন্য হ'য়ে থাকে। ফ্রয়েড এটাকে এক রকমের মানসিক বিকার বলে অভিহিত করেছেন এবং এর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

QUESTIONS

1. What is meant by Perception ? How it differs from Sensation ? Explain your answer with concrete example.

2. Define Perception. What are its characteristics ?

3. What do you mean by the expression—"our Perception of things is an organised experience" ? What are the factors that determine Perceptual organisation ?

4. "Our Perception of things is a complete knowledge where as Sensation is only an isolated stimulation"—explain.

5. How are three dimensions perceived ?

6. Name and explain the different cues to the Perception of distance and depth.

7. "Mental causes are more important than physiological causes in the Perception of three dimension"—Discuss.

8. What do you mean by False Perception ? Writ what do you know about them.

9 "False Perception has nothing to do with the stimulus and as such can not be included within the discussion of perception." Do you agree ?

10. What is an Illusion ? Why they are caused ? Illustrate a few of them.

11 Write short notes on :—

(a) Symmetry, proximity, similarity ; (b) Retinal disparity (c) Convergence ; (d) Accomodation ; (e) Stereoscope ; (f) Hallucination ; (g) Muller-lyrer illusion ; (h) Light and shade ; (i) Aerial perspective.

সংযোগ

[Association]

আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে আমরা যখন তাজমহল দেখি তখন সংগে সংগে আমাদের সম্রাট শাজাহানের কথা মনে পড়ে। গীতাঞ্জলির কথা উঠ্‌লেই কবিগুরুর কথা মনে পড়ে যায়। কোন বিশেষ জায়গায় হয়তো অনেকদিন আগে একবন্ধুর সংগে বেড়াতে গিয়েছিলে তারপর পরে আবার একলা বা অন্য কারো সংগেই যাও সে বন্ধুর কথা মনে পড়বেই। এই যে দুটো ঘটনা একসংগে মিশে থাকে, অর্থাৎ একটার বর্তমানে আর একটাকে মনে পড়ে তাকে মনোবিজ্ঞানে বলে সংযোগ (Association)। এটা হ'ল একটা মনের বিশেষ গুণ। সংযোগ হ'ল মনের সেই বিশেষ গুণ যা দুটো অতীতের ঘটনার মধ্যে এমন যোগ সূত্র স্থাপন করে যে তাদের মধ্যে যে কোন একটার স্মৃতি আমাদের সচেতন মনে এলে অথবা তাদের যে কোন একটার বাস্তব অবস্থিতি আর একটাকে স্মৃতি থেকে টেনে আনে। যেমন ধর, তুমি তোমার কোন বন্ধুকে নিয়ে তাজমহল বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন তোমাদের শাজাহানের কথা মনে পড়েছিল। তোমরা তার সৌন্দর্য বোধের প্রশংসা করেছিলে নিশ্চয়ই। তারপর বহুদিন পরে যখন তোমার সেই আগের বন্ধুকে ছাড়াই তুমি তাজমহলে গেলে সংগে সংগে তোমার আগের স্মৃতি মনে পড়লো। সেই বন্ধুর কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো সে দিন কি কি করে ছিলে।

মনের মধ্যে এই যে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয় এ ধারণা বহুযুগ থেকে চলে আস্‌ছে। বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলও (Aristotle) একথা বলেছেন যে এটা একটা মনের বিশেষ ক্ষমতা। বিভিন্ন দার্শনিক এবং বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি তা হ'ল—এই যে দুটো ঘটনা মনে এমনি ভাবে জুড়ে থাকে এর কতকগুলো কারণ আছে। যে ঘটনার উপস্থিতিতে অন্য ঘটনার স্মৃতি আমাদের মনে পড়ে তাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন পুনশ্চৈতন্যকারী ঘটনা (Reviving idea) আর যে ঘটনাটি মনে পড়ে তার নাম দিয়েছেন পুনশ্চৈতন্য ঘটনা (Revived idea)। এই পুনশ্চৈতন্য কারী ঘটনা আর পুনশ্চৈতন্য ঘটনা নিজেদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধন সৃষ্টি করে। এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের তিন রকম বন্ধন (Connection) থাকে। আর এই তিন রমক বন্ধন

অনুযায়ী সংযোগের তিন্টি স্থূত্র করা হয়েছে। এই স্থূত্রগুলো হ'ল—[1] সন্নিধির স্থূত্র (Law of contiguity), [2] সাদৃশ্যের স্থূত্র (Law of similarity, আর [3] বৈসাদৃশ্যের স্থূত্র (Law of contrast) এখন আমরা সংযোগের এই স্থূত্রগুলো সম্বন্ধে পর পর আলোচনা করবো।

[1] **সন্নিধির সূত্র** (Law of Contiguity) : যে সব ঘটনাকে এক সংগে ঘটতে আমরা দেখি, অথবা খুব কম সময়ের তফাৎ এ ঘট্তে দেখি তারা আমাদের মনে সংযোজিত হয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে কোন একটা ঘটনা আর একটা ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। ধর, তোমার দাত্ব একটা লাঠি ব্যবহার করতেন, এখন তিনি নেই। কিন্তু বাড়ীতে তার সেই লাঠিটা দেখলে সংগে সংগে তোমার দাত্বর কথা মনে পড়ে যায়। আগে তুমি লাঠিটা দাত্বর সংগেই দেখেছ। তাই দাত্ব আর তার লাঠি আমাদের মনে সংযোগ স্থাপন করেছে। এখন লাঠি দেখ্লেই দাত্বর কথা মনে পড়ে। ঘটনার এই সন্নিধি দুদিক থেকে হতে পারে—[a] অবস্থানের দিক থেকে (Contiguity in space) আর [b] সময়ের দিক থেকে (Contiguity in time)।

[a] যে সব ঘটনা আমাদের মস্তিষ্ককে একই সংগে উত্তেজিত করে তারা সহঅবস্থানের জন্য সংযোগ স্থাপন করে। এদের অনেক সময় বলা হয় সমকালীন অবস্থানের জন্য সংযোগ (Simultaneous association)। যেমন ধর আমরা কাঁচা আম খাই তখন আমাদের দুটো ইন্দ্রিয় কাজ করে। চোখের দ্বারা দেখি। আমটা সবুজ, আর জিহ্বার দ্বারা অনুভব করি আমটা টক। পরে আমরা যখনই সবুজ আম দেখি তখনই আমাদের মনে পড়ে এটা টক হবে।

[b] আমরা সারাদিনে অনেক কাজ করি। তাদের মধ্যে যে সব কাজগুলোর মধ্যে সময়ের তফাৎ অপেক্ষাকৃত কম তারা সংযোগ স্থাপন করে। এটাই হ'ল সময়ের দিক থেকে সন্নিধি (Contiguity in time)। আর এই ধরনের সংযোগকে বলা হয় ক্রমানুবর্তীতার জন্য সংযোগ (Successive association)। যেমন ধর, যখন আমরা কবিতা মুখস্ত করি তখন একটা শব্দের সংগে তার পরের শব্দের সংযোগ স্থাপন হয়। তারপর একটা লাইনের সংগে পরের লাইনের হয়। এমনি করে পুরো কবিতাটা মুখস্ত হয়ে যায়। এখন প্রথম কথাটা মনে পড়লে সংযোগের জন্য তার পরের কথাটা মনে এসে যায়। তোমরা এও বোধ হয় দেখেছ মাঝে মাঝে ভুলে গেলে—একটা কথা বা লাইন বলে দিলে আবার সবটা বলে যেতে পার। এর কারণ হ'ল যেখানটা ভুলে যাও সেখানটা ঠিকমত সংযোগ স্থাপন হয়নি।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আস্তে পারি যে—যে সব ঘটনা গুলো একই সময়ে আমাদের সাম্‌নে ঘটে বা যে সব ঘটনার মধ্যে সময়ের পার্থক্য কম তারা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। সময়ের পার্থক্য যত কম হবে সংযোগ তত দৃঢ় হবে। আর একটা কথা এখানে মনে রাখ্‌তে হবে যে শুধুমাত্র সময়ের পার্থক্য কম হ'লে চল্‌বে না আমাদের মনোযোগ ও থাকা চাই। একটা উদাহরণ দিলে এ কথার তাৎপর্য বুঝবে। ধর তিনজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তুমি তাদের একজনকে চেনো, বাকী দু'জনকে চেন না। এখন তুমি তাদের ভাল করে না দেখে, শুধু যাকে চেনো তাকেই বেশী করে লক্ষ্য করলে। ফলে ঐ তিনজনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হ'ল না—যদিও তারা পাশাপাশি আছে। সুতরাং সন্নিধির জন্য যে সংযোগ স্থাপন হয় তাতে মনোযোগের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবার যে সব জিনিসগুলো আমরা যত বেশীবার এক সংগে দেখ্‌বো তাদের সংযোগ তত দৃঢ় হবে। ক্রমানুবর্তিতার জন্য যে সংযোগ হয় তার সংযোগ ক্রমানুসারে থাকে। অর্থাৎ যে ভাবে পর্‌পর আমরা শতকিয়া মুখস্ত করে থাকি সেই ভাবেই বল্‌তে পারি। কেউ আট বল্‌লে নয়ই মনে হয়, সাত মনে হয় না। এই জন্য আমাদের শতকিয়া নিচ থেকে বল্‌তে অসুবিধা হয়।

[2] **সাদৃশ্যের সূত্র** (Law of Similarity) : তোমার বন্ধুর ভাইকে দেখে বন্ধুর কথা সংগে সংগে মনে পড়ে। আমরা যখন বাড়ী থেকে দূরে থাকি তখন মা, বাবা, ভাইবোনদের ছবি সংগে রাখি। আর ছবি দেখার সংগে সংগে তাদের আসল মুখ গুলো যেন আমাদের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। তাহ'লে আমরা ব'ল্‌তে পারি আপাত দৃষ্টিতে দেখ্‌তে একই রকম জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যেমন এখানে বন্ধুর ভাইকে দেখলে বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। এর কারণ হ'ল তাদের মধ্যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। এই কারণে একটা গদ্যের চেয়ে একটা কবিতা তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়। কবিতার পর পর লাইনের মধ্যে একই রকম ছন্দ থাকে।

[3] **বৈশাদৃশ্যের সূত্র** (Law of Contrast) : বিদেশে গিয়ে আমরা যখন খুব অসুবিধায় পড়ি তখন আমাদের বাড়ীর সুখের কথা মনে পড়ে। স্কুলের বোর্ডিং এ খেতে বসে বাড়ীতে মায়ের হাতের খাওয়ার কথা মনে পড়ে। যখন আমরা খুব দুঃখ পাই তখন আমাদের সুখের দিন গুলোকে মনে পড়ে। তাহ'লে আমরা বলতে পারি বিসদৃশ জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

একে বলা হয় বৈসাদৃশ্য জনিত সংযোগ। যখন আমরা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাটতে থাকি তখনই আলোর কথা মনে পড়ে।

তিনটি সূত্র সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা

অনেক মনোবিজ্ঞানী চেষ্টা করেছেন সংযোগের এই সূত্রগুলোকে সহজ করার জন্য। যেমন, জেমস্ (James) এর মতে সংযোগের একটা মাত্র সূত্র হ'তে পারে আর সেটা হল সন্নিধির সূত্র। তার মতে সাদৃশ্যের জন্য আমাদের মনে যে সংযোগ স্থাপন হয় তার মূলে আছে সান্নিধ্য (Contiguity)। যে জিনিস আর ঘটনা-গুলো একই রকম দেখতে সেগুলো আমাদের মনে পাশাপাশি থাকে ঠিকই। কিন্তু তার মতে যখন একটার উপস্থিতিতে আর একটাকে আমাদের মনে পড়ে সেটা হয় তাদের গুণগত সান্নিধ্যের জন্য। তাই তার মতে সাদৃশ্য হ'ল সান্নিধ্যের একটা বিশেষ-ক্ষেত্র মাত্র (Special case)। আবার তেমনি বিসদৃশ জিনিসগুলোও আমরা এক সংগে চিন্তা করি। তাই এখানেও বলা যেতে পারে যে প্রকৃত পক্ষে ঋণাত্মক সান্নিধ্যই এখানে প্রধান।

স্পেনসার (Spencer), ষ্টিফেন (Stephen) প্রভৃতি দার্শনিকরা মনে করেন যে সাদৃশ্যের সূত্রই একমাত্র সংযোগের সূত্র। নিকটের জিনিসগুলো (Law of contiguity) আমাদের মনে পড়ে তার কারণ হ'ল অবস্থান এবং সময়ের দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সাদৃশ্যই তাদের নিকটতর করে দিচ্ছে।

হ্যামিলটন (Hamilton), হফ্ডিং (Hoffding) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা আবার বলেন যে সন্নিধি আর সাদৃশ্য এই দুটো মিলে আমাদের সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। তাদের মতে নিকটতর এবং সদৃশ্য জিনিসগুলো একই মানসিক অবস্থার অন্তর্গত। এখন একই মানসিক অবস্থার খণ্ড খণ্ড অংশ কোন সময় হ'তে পারে না। তাই সাদৃশ্য বা সন্নিধি আলাদা আলাদা ভাবে ঘট্তে পারে না। সুতরাং একই মানসিক অবস্থার অন্তর্গত কোন কিছু মনে এলে বাকী কিছুটা অংশ ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু কোন মানসিক অবস্থাই অংশ বিশেষ ঘট্তে পারে না, তাই সেই অবস্থার অন্তর্গত অন্য জিনিসগুলোও সংগে সংগে, আমাদের মনে এসে যায়। এই সূত্রকে তারা নাম দিয়েছেন পুনঃ সংযোজনের সূত্র (Principle of Redintegration)।

এই তিনটে মতবাদের মধ্যে শেষের মতটাকে এখন মেনে চলা হয়। কারণ এই মতটা দুটো প্রয়োজনীয় মতকে সমন্বয় করেছে। এই দুটো জিনিস অর্থাৎ সাদৃশ্য

আর সান্নিধ্য আলাদা হ'তে পারে না। সাদৃশ্য না থাকলে সান্নিধ্য হতে পারে না বা সান্নিধ্য না থাকলে সাদৃশ্য থাকতে পারে না। যেমন ধর, তোমার বন্ধুর নাম সুনীল। যখন অন্য কোথাও কাউকে সুনীল ব'লে ডাকতে শোন সংগে সংগে তোমার বন্ধু সুনীলের মুখটা তোমার মনে পড়ে। কারণ ঐ নামটা আর মুখটার মধ্যে সান্নিধ্য আছে। কিন্তু আসলে যা ঘটে তা হ'ল এই—প্রথমে যখন সুনীল ডাক শুনলে তখন সাদৃশ্য জনিত সংযোগের জন্য তোমার মনে সুনীল কথাটা আসছে। পরে সুনীল নামের সংগে যে বন্ধুর মুখটা তোমার মনে পড়ছে সেটা সান্নিধ্যের জন্য। অর্থাৎ এই ভাবে কাজ হচ্ছে।

ডাকে
সুনীল (অপরিচিত) [নামের সাদৃশ্য] সুনীল
|
(বন্ধু) সান্নিধ্যে জন্য — সুনীলের মুখ
তোমার মনে ভসে উঠছে।

এখানে যেমন সাদৃশ্য থেকে সান্নিধ্যে এলো তেমনি সান্নিধ্য থেকে সাদৃশ্যে আসতে পারে। যেমন, তোমার কোন পরিচিত লোকের নাম যোগেশ। তুমি যখন অন্য কোথাও যোগেন নামে কোন লোককে দেখ সংগে সংগে তোমার যোগেশের কথা মনে পড়ে কারণ এদের উচ্চারণ দুটো এক। কিন্তু আসল কারণ হ'ল এদের নামের প্রথম অংশ দুটো এক। কিন্তু একটির শেষে আছে 'শ' অপরটির 'ন' তাহ'লে আমরা বলতে পারি তাদের নামের প্রথম অংশটা সাদৃশ্যের জন্য মনে পড়ছে ঠিকই কিন্তু শেষ অংশটা আসছে সান্নিধ্যের জন্য অর্থাৎ

যোগে ন
সাদৃশ্য— |
যোগে সান্নিধ্য শ

সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সান্নিধ্য আর সাদৃশ্য দুটো আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের সংযোগে সাহায্য করে না। দুটো একসঙ্গেই কাজ করে। এদের মধ্যে যে পার্থক্য একেবারে নেই তা নয়। তবে ঐ ধরে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে শেষের যে সূত্রটি অর্থাৎ পুনঃসংযোজনের সূত্রটিই গ্রহণযোগ্য। আর একটা কথা বলে সংযোগ সম্বন্ধে এই আলোচনা শেষ করবো। শেষের এই সূত্রটির মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সূত্রের কোন উল্লেখ নেই। এই সূত্রটিকে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকরা আলাদা সূত্র হিসাবে ধরেন না। তারা বলেন যে বিসদৃশ জিনিসগুলো একই

গোষ্ঠীভুক্ত তাই সদৃশ। আলো এবং অন্ধকার আমরা চোখ দ্বারাই অনুভব করি আবার এও ঠিক যে বিভিন্ন বিসদৃশ জিনিসগুলো সুবিধার জন্য একই সংগে চিন্তা করি। সেদিক থেকে তারা নিকটবর্তী (সান্নিধ্য)। সুতরাং বৈসাদৃশ্যের সূত্র কোন আলাদা থাকতে পারে না। আপাত: বৈসাদৃশ্যের জন্য যে সংযোগ স্থাপন হয় তাকে আমরা সাদৃশ্য বা সান্নিধ্যের সূত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি।

QUESTIONS

1 How two things are associated together ?

2 Critically discuss the laws of Association.

3. State the principle of redintegration and critically evaluate its importance in the formation of mental association.

4. "The Law of contiguity is the only law of Association' —Discuss.

5. Write short notes on :—

(a) Contiguity of time ; (b) Contiguity in spaec ;

(c) Successive Association ; (d) Law of contrast ;

(e) Law of similarity.

স্মৃতি

[Memory]

আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি "শ্যামের স্মৃতিশক্তি খুব কম, ও কিছুই মনে রাখতে পারে না। বা যদুর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ও একবার পড়লেই সব বেশ মনে রাখে।" কন্তু এই স্মৃতিশক্তি কি? এর কোন নির্বচন নেই যে একে এক কথায় বুঝিয়ে বলা যায়। মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস্ (William James) মনে করেন স্মরণ ক্রিয়া বা স্মৃতি হ'ল আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক। অর্থাৎ যে সব জিনিস এখন আমাদের চেতন মনে নেই অথচ পূর্বে ছিল, সেই সব জিনিসকে প্রয়োজন বোধে চেতন মনে আনাকে ব'লবো স্মরণ করা বা স্মরণক্রিয়া। আবার উড্ওয়ার্থ (Woodworth) স্মৃতিকে বলেছেন সেই মানসিক ক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা যে কাজ শিখেছি তা পরে করতে পারি। তার মতে আমরা যখন কিছু শিখি এবং তারপরে আবার যখন ঠিকই একই উপায়ে সেই কাজ করি তখন তার পেছনে স্মৃতি কাজ করে।

এই স্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। স্মৃতি বলতে আমরা বুঝি একটা বিশেষ্য, একটা গুণ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে যে জিনিসটার কথা আলোচনা করবো সেটা বিশেষ্য নয় একটা ক্রিয়া। অর্থাৎ, স্মরণক্রিয়া। এই স্মরণক্রিয়ার আলোচনা বহুদিন থেকে চলে এসেছে। দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) এই স্মরণক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই স্মরণক্রিয়ার আলোচনা করেন মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্ (Ebbinghaus) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। 1885 খৃষ্টাব্দে তিনি স্মরণক্রিয়ার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা করার পর একটি বই প্রকাশ করেন। তার এই বইয়েই তিনি প্রথম বলেন যে মানুষের শিক্ষা পদ্ধতি, এবং স্মরণক্রিয়া পরীক্ষাগারে অনুধাবন করা যায়। আর এর পর থেকেই এই স্মরণক্রিয়ার উপর পরীক্ষাগারে গবেষণা শুরু হয় এবং স্মৃতিশক্তি পরিমা করাব কাজ শুরু হয়।

এবিংহস্, তার স্মৃতির উপর এই সব পরীক্ষা পদ্ধতিকে নৈর্ব্যাক্তিক (Objective) এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন জিনিস থেকে সংযোগমুক্ত করার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষায়ই অর্থ-বিহীন বর্ণমালার (Nonsense syllable) ব্যবহার করেন। তার ধারণা ছিল

স্মৃতি শক্তি বা স্মরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। তাই মানুষের এই সহজাত গুণটাকে মাপতে হ'লে তার উপর অভিজ্ঞতার যে প্রভাব আছে সেটাকে বাদ দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতার সংযোগের ফলে আমরা তাড়াতাড়ি মনে রাখতে পারি। এই সংযোগ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যই তিনি কতকগুলো নতুন বর্ণ সমষ্টির আবিষ্কার করেন, যার সংগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন কিছুর মিল নেই। এই বর্ণ মালার দু'দিকে ইংরেজী বর্ণমালার দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ (Consonant) আর মাঝে একটা স্বরবর্ণ (Vowel) থাকে, যেমন, LAR, TIR, এই রকম। এই অর্থবিহীন বর্ণ সমষ্টি তৈরী করার কতকগুলো নিয়ম আছে। পরীক্ষাগারে স্মরণক্রিয়ার উপর পরীক্ষা যখন করবে তখন এই সম্বন্ধে বিষদভাবে তোমরা শিখবে।

আগেই বলেছি আমরা কোন কিছু শেখার পর আবার যখন সেই কাজ করি তখন তাকে বলি স্মরণ করা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে শেখা থেকে শুরু করে আবার ঠিক সেই ভাবে কাজ করা পর্যন্ত যে সমস্ত প্রক্রিয়া আমাদের মনে ঘটে তার সমস্তটাকে মিলে আমরা বলি স্মরণক্রিয়া। যেমন—প্রথম আমরা শিখছি, তারপর কিছু সময় পরে আবার শেখা জিনিস মনে করছি। ধর একটা কবিতা মুখস্থ করলাম। তার পরের দিন ক্লাসে গিয়ে মুখস্থ বলছি। কিন্তু এই দুটো সময়ের মাঝখানে যে সময়টা সেটা কি হয় ? নিশ্চয় ফাঁক থাকে না। এই সময়টায় অধীত জিনিসটাকে বা কবিতাটাকে আমাদের মন ধরে রাখে। এই সব বিচার বিশ্লেষণ করে স্মরণক্রিয়াকে চারটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয়েছে। যে সময়টা আমরা শিখছি, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা কোন স্মরণ রাখার বস্তুকে প্রথম শিখছি তাকে বলা হয় স্থিরিকরণ বা শেখা (Fixation বা Learning)। তারপর যে বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলে সেটা আমাদের মনে থাকছে সেটাকে বলা হয় ধারণ বা সংরক্ষণ (Retention)। এখন এই মনে অবস্থিত জিনিস গুলোকে ঠিকমত পরে কাজে লাগাই যার সাহায্যে সে দুটো হ'ল পুনরুদ্রেক (Recall) আর পরিচিতি বা প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)। এই পুনরুদ্রেক আর প্রত্যাভিজ্ঞার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। পুনরুদ্রেক হ'ল এক ধরনের কল্পনা। আগের শেখা জিনিসের অবর্তমানে যখন সেটাকে স্মরণ করি তখন আমরা পুনরুদ্রেকের সাহায্য নিই। যেমন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়—"পলাশীর যুদ্ধ কত খৃষ্টাব্দে হয়েছিল? সংগে সংগে ইতিহাসের জ্ঞান তোমার মনে পুনরুদ্দীপ্ত হয় এবং যার ফলে বলতে পার 1757 খ্রীষ্টাব্দে। আবার পাঁচটা ছবি দেখিয়ে তোমাকে যদি বলা হয়—"এর মধ্যে কোনটা তোমার বন্ধু রমেনের ছবি ?" তখন তোমাকে সমস্ত গুলোর মধ্য থেকে বেছে

বের করতে হয় কোন্‌টা তোমার পরিচিত বন্ধুর ছবি। একে বলা হয় পরিচিতি বা প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)। প্রত্যাভিজ্ঞা বলে পূর্বের বস্তুর বর্তমানে তাকে স্মরণ করার ক্রিয়াকে। এটাকে এক ধরনের বিশেষ প্রত্যক্ষণ বলে। এখন আমরা স্মরণক্রিয়ার এই চারটে পর্যায় সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো।

স্থিরিকরণ বা শিক্ষা [Fixation or Learning]

তোমরা শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ কি বোঝায় জান। কোন জিনিস স্মরণ রাখতে হ'লে যা আমাদের সর্ব প্রথম করতে হয় তাই হ'ল শিক্ষা। শিক্ষা যে কি তা সঠিক সূত্র (Definition) দিয়ে বোঝান যায় না। শিক্ষার দ্বারা পরিবেশের কোন জিনিসকে আমরা মনের সংগে গেঁথে নিই। অর্থাৎ কোন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে মনের অংশ বিশেষে (System) পরিণত করি। পরে এই শিক্ষা, জীবনে কোন নতুন সমস্যাকে (problem) সমাধান করতে সাহায্য করে। একে এক কথায় বলা যায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া (Process of acquiring knowledge)। অন্য ভাবে বলতে গেলে কোন বিষয় বস্তুকে পুনঃপুনঃ উপস্থাপন (present) ক'রে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানোকে বলে শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Learning Process। সুতরাং শিক্ষা হ'ল একটা মনের সক্রিয় প্রক্রিয়া (activc process), এবং এর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা যখন কবিতা মুখস্ত করি, তা কতক্ষণ পর্যন্ত পড়বো ঠিক করে নিই। অর্থাৎ একবার ঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করার আগে পর্যন্ত পড়তে হবে। এই যে একবার ঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারা, এটাই হ'ল নির্দিষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা যতবার দরকার অতীত বস্তুকে উপস্থাপন করি। এই শিক্ষাপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের একটা বিরাট আলোচনার ক্ষেত্র। এখানে তোমাদের খুব সামান্য কিছু বলা হবে। কারণ এটা তোমাদের পাঠ্যের মধ্যে নেই।

শিক্ষা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি। অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যখন আমরা কবিতা মুখস্ত করি তখন আমাদের খুব বেশী বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয় না। শুধু মাত্র কবিতার লাইনগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি করে আমাদের মুখস্ত করতে হয়। একে বলে সংযোগগত শিক্ষা (associative learning)। এ ছাড়া অনেক শিক্ষা আছে যেখানে আমাদের বিচার বুদ্ধির দরকার হয়। যেমন যখন আমরা বীজগণিতের সূত্র শিখি, তখন আমাদের বুদ্ধির দরকার হয়। অর্থাৎ কি করে সূত্রটা এল তা বের করতে হ'লে আমাদের বার বার কষে সেটাকে দেখতে হয়। প্রথম সেটা ভুল হ'তে পারে আবার সে ভুলটা ঠিক করে

করলে অন্য একটা ভুল হ'তে পারে। এমনি করে পর পর ভুল শুধ্‌রে নিজে থেকে শিক্ষা করাকে বলে, পুনরাবৃত্তি ও ভ্রান্তি দূরীকরণ শিক্ষাপদ্ধতি (Trial and error learning)। এ ছাড়াও খুব বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন এক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি আছে। অর্থাৎ এখানে আমরা সমস্যার সমাধানে হঠাৎই পৌঁছে যাই। একে বলা হয় দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা (Insight full learning)। এই সমস্ত রকম পদ্ধতিই আমরা সাধারণ জীবনে কাজে লাগাই। কারণ শিক্ষা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। জন্মের পর থেকেই আমাদের শিক্ষা শুরু হয়। সকালে উঠে মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে জীবনে নানা রকম জটিল সমস্যা সমাধানের সমস্ত রকম শিক্ষাই আমাদের হয়। এই তিন রকম শিক্ষা ছাড়া আমাদের শিক্ষা আর এক ভাবে হ'তে পারে সেটা হ'ল প্রতিক্রিয়া আর উত্তেজকের মধ্যে বিশেষভাবে সংযোগের ফলে (Conditioning)। এখানে যে প্রতিক্রিয়া আর উত্তেজনার মধ্যে সংযোগ হয় তাদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আমরা ঠিক নির্দিষ্টভাবে সাড়া দিই। অর্থাৎ প্রত্যেক উত্তেজনার সংগে একটা করে প্রতিক্রিয়া সংযুক্ত থাকে। যেমন আমাদের সামনে খাবার রাখলে জিহ্বায় জল আসে। সুতরাং খাবার আর জিহ্বার জল (Saliva) একই সংগে সংযুক্ত। এটা আমাদের শিক্ষা করতে হয় না, এটা স্বতঃশ্চল। কিন্তু এখন আমাদের যদি রাস্তায় আলু কাব্‌লিওয়ালার ডাক শুনলে জিহ্বায় জল আসে তাহ'লে বলবো এটা আমাদের স্বতঃশ্চল প্রক্রিয়া নয়। জিহ্বায় জল আসার প্রতিক্রিয়া এক মাত্র খাদ্য বস্তুর সংগে সংযুক্ত কিন্তু এখানে পুনরাবৃত্তির ফলে এই প্রতিক্রিয়া আলু কাব্‌লিওয়ালার ডাকের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। একে বলে Conditioning। এটা কিভাবে হয় এবং কেন হয় সে তোমাদের এখন জানার দরকার নেই। রুশ দেশীয় শরীর বিজ্ঞানী প্যাভলভ্‌ (Pavlov) এর প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি কুকুরের উপর পরীক্ষা করে এই তথ্যের প্রমাণ করেন। তোমরা শুনে থাকবে কিছুদিন আগে রাশিয়া যে স্পুট্‌নিকে কুকুর পাঠিয়েছিল তাতে কুকুরকে এই পদ্ধতির দ্বারা খাওয়ানো হ'তো।

এই সব শিক্ষাপদ্ধতি কি ভাবে হয় তার সূত্র আছে। যেমন সংযোগগত শিক্ষার উপর থর্ন্‌ডাইকের (Thorndike) দুটো সূত্র আছে—অভ্যাসের সূত্র (Law of exercise) আর ফলাফলের সূত্র (Law of effect)। আবার Conditioning এর দ্বারা শিক্ষারও সূত্র আছে। এর সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমরা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি (Nature of learning

Process) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু ব'লে এই আলোচনা শেষ করবো।

শিক্ষার পদ্ধতির একটা বিশেষ গুণ হ'ল এটা একটা ক্রমবর্দ্ধমান প্রক্রিয়া (Gradual Process)। আমরা কোন জিনিসই হঠাৎ শিখে ফেলি না। অর্থাৎ কোন জিনিসকে বা অভিজ্ঞতাকে মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হ'লে তাকে বার বার উপস্থাপন করতে হয় এবং প্রত্যেক উপস্থাপনে কিছুটা করে আমাদের মনে থেকে যায়। এমনি বার বার করার ফলে এক সময় সব জিনিসটা আমরা মনে রাখতে পারি। কোন বিশেষ ব্যক্তির বিভিন্ন উপস্থাপনে শিক্ষার পরিমাণকে আমরা যদি ছক কাগজে (Graph paper) বসাই তাহ'লে যে লেখ চিত্র হয় তা একটা বিশেষ আকার ধারণ করে। নীচের ছবিতে এই রকম একটি লেখচিত্র দেখানো
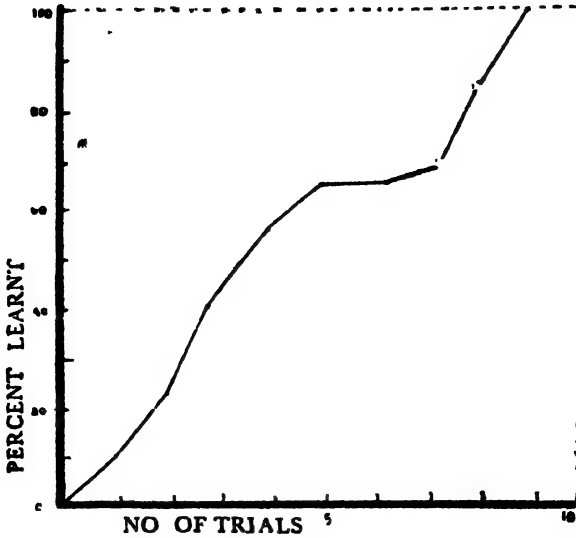
(Curve of learning)

হ'ল। এর x অক্ষ বরাবর পুনরাবৃত্তি ও y অক্ষ বরাবর শতকরা শিক্ষার হার ধরা হ'য়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার হার প্রথম খুব দ্রুত হয় তারপর একটা সময় আসে যখন এই বৃদ্ধির হার কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঐ লেখ প্রায় x অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সব উপস্থাপনে আমরা কিছু শিক্ষা করি না। একে বলে Plateau। এর পর হঠাৎ আবার আমাদের শিক্ষার হার বাড়তে থাকে এবং কিছু পরেই আমরা লক্ষ্যে পৌছাই।

কেন এই Plateau হয়, আর শিক্ষা প্রতিক্রিয়ারই বা বিশেষ প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনা করবো না। কারণ এটা তোমাদের পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে স্মৃতি পড়ার জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তোমাদের কিছু জানার দরকার বলে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম। বস্তুর উপস্থাপনের ওপর শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন রকম নাম আছে। সে আলোচনা পরে এসে যাবে। তবে এটুকু মনে রাখার দরকার স্মৃতির প্রথম ধাপ হ'ল শিক্ষা। শিক্ষা-পদ্ধতি যে কোন ধরনেরই হউক এই শিক্ষালব্ধ বস্তুকে কিভাবে আমরা মনে রাখি এবং পরে স্মরণ করি সেটাই হ'ল আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

পুনরুদ্রেক [Recall]

পুনরুদ্রেক (Recall) আর পরিচিত বা প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) এদের উভয়ের আলোচনা আসলে ধারণের (Retention) পর হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে এদের আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি তার কারণ হ'ল এ দুটো না থাকলে, ধারণ করার ক্ষমতা (Retentive power) যে আছে তা উপলব্ধি করতে পারবো না। কোন জিনিস শেখার পর সেটা যে সবটা আমাদের মনে থাকবেই তার কোন মানে নাই। কতটা আছে স্মৃতিতে তা নির্ভর করে সেই আগের জিনিসের যতটা আমাদের মনে পুনরুদ্রুত হয় তার উপর। যদি কোন জিনিসকে আমরা মনে পুনরুদ্রেক না করতে পারি তাহ'লে বলবো যে তার কোন স্মৃতি নেই। ধর, তুমি ইতিহাসে পড়লে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল 1757 খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু মাষ্টারমশায় যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি তখন সালটা বলতে পারলে না। তার মানে ওর কোন স্মৃতি তোমার মনে নেই। আর স্মৃতি নেই কেন? তুমি পড়েছিলে বা শিখেছিলে কিন্তু এখন তোমার মনে সেটা পুনরুদ্দীপ্ত হ'ল না। তাহ'লে ধারণ ক্রিয়া নির্ভর করছে পুনরুদ্রেক ক্রিয়ার (Process of recalling) ওপর। পুনরুদ্রেক বলতে আমরা সেই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে বলবো যেগুলো আমাদের কোন কিছু শেখা জিনিসকে স্মরণ করতে হ'লে বা চেতনায় আনতে হ'লে মনের মধ্যে ঘটে থাকে।

এই পুনরুদ্রেক ঘটে সংযোগের (Association) জন্য। তোমরা সংযোগ সম্বন্ধে আগেই পড়েছ। এর সমস্ত রকম সূত্রই এখানে প্রযোজ্য। তবে একটা বিশেষ জিনিস মনে রাখার আছে স্মরণ করায় বা পুনরুদ্রেকে যে সংযোগ কাজ করে তা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় সংযোগ। অর্থাৎ আমাদের কোন জিনিসকে স্মরণ করার পেছনে একটা মানসিক চেষ্টা থাকে। এই সংযোগের সামান্য বিভিন্নতা অনুযায়ী

আমরা পুনরুদ্রেককে দুভাগে ভাগ করতে পারি। (i) প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক (Direct recall) আর (ii) পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall)। প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক আমরা সেগুলোকে বলি যখন কোন জিনিসকে মনে আনার জন্য অন্য কোন ধারণার সাহায্য নিতে হয় না। আবার যখন পুনরুদ্রেকের সময় অন্য ধারণার সাহায্য নিই তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect- recall)। ধর রামের কথা বললেই শ্যামের কথা মনে আসে। এখানে শ্যামের কথা মনে আসার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া আছে তাকে বলছি প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক (Direct recall। আবার রামের কথা থেকে যখন যদুর (শ্যামের ভাই) কথা মনে পড়ে তখন তোমাকে আগে শ্যামের কথা ভাবতে হয়, তারপর শ্যামের সংগে যদুর সংযোগ হয়। অর্থাৎ এখানে পুনরুদ্রেকের জন্য আবার ধারণার সাহায্য নিতে হচ্ছে একে বলে পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (Indirect recall)। এখানে মনে রাখবে, সংযোগ স্থাপন করা মনের একটা বিশেষ গুণ। একথা সংযোগের আলোচনার সময় বলেছি। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত জিনিস গুলো মনে আনছি তা হ'ল পুনরুদ্রেক। সুতরাং পুনরুদ্রেক আর সংযোগকে এক বলে ভেবোনা। সংযোগ আমাদের পুনরুদ্রেক ঘটায়। মনোবিজ্ঞানী মিচেটি আর পোর্টিচ (Michottee & Portych) দুরকম পুনরুদ্রেকের উপর অনেক গবেষণা করে দেখেছেন। তাদের মতে শেখার পর দিন যত যেতে থাকে আমাদের প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক ক্ষমতা তত কমতে থাকে। অর্থাৎ বহুদিন পরে কোন জিনিসকে মনে করার জন্য আমাদের পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের সাহায্য নিতে হয়।

নামের পুনরুদ্রেক [Recalling of names] : বহুদিন বাদে স্কুলের এক বন্ধুর সাথে দেখা। অনেকদিন কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য তুমি তার নাম ভুলে গেছ। দেখা হ'লে কথা বললে। হঠাৎ যদি সে জিজ্ঞেস করে "আমাকে চিনতে পারছো তো ?" ভদ্রতার খাতিরে বললে 'হ্যাঁ' ; কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলার পরও তুমি তার নাম মনে করতে পারছো না। তারপর সে চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়তো তোমার নামটা মনে পড়লো। এই সব ভুলে যাওয়া নাম পুনরুদ্রেকের সময় যে মানসিক প্রক্রিয়া হয় সে সম্বন্ধে জেমস্ (James) ওয়েঞ্জল্ (Wenzl) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা অনেক আলোচনা ক'রেছেন। তাদের মতে আমরা যখন কোন ভুলে যাওয়া নাম স্মরণ করতে চাই তখন মনে অনেক ভুল নাম মনে পড়ে। আর এই সব ভুল নামের সংগে আসল নামের একটা সাদৃশ্য থাকে, ওয়েঞ্জল্ বলেন— আমাদের ভুলে যাওয়া নামের পুনরুদ্রেক সুরু হয় একটা সাধারণ গুণ থেকে

(General characteristics) এবং আস্তে আস্তে সেটা শুধরাতে শুধরাতে ঠিক দিকে এগিয়ে যায় "The Process of recalling a name starts with general characteristics of the name and advances towords the specific !" যেমন,—আমি মনে করতে চাই যে নামটা সেটা হ'ল রহিম। কিন্তু প্রথমে আমার মনে পড়লো 'করিম'। এ দুটো নামের উচ্চারণ গত দিক থেকে মিল আছে। তারপর হয়তো মনে পড়লো কবীর। এমনি করতে করতে রহিম নামটা মনে এল। এমনি করে অপর্ণা'র নাম করতে যেয়ে হয়তো প্রথমে মনে পড়ে সুপর্ণা, ইত্যাদি।

পুনরুদ্রেক মুহূর্ত [Condition of readiness] : পুনরুদ্রেক সম্বন্ধে আর একটা জিনিস বলার আছে। তোমাদের সব্বাই-এর বোধ হয় অভিজ্ঞতা আছে যে কোন জিনিসের সমস্ত কিছু মনে আসছে, তবু জিনিসটা ঠিক কি তা বলতে পারছো না।. ধর, একটা কবিতার কয়েক লাইন কেউ তোমার সামনে আবৃত্তি করলো, তুমি সংগে সংগে ভাবতে সুরু করলে, কবিতাটার কি নাম, বা কোন বইয়ের কবিতা। তোমার কাছে জিনিসটা এত পরিচিত যে তুমি এক্ষুণি বলে ফেলতে পারো কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছো না। এটা ঠিক একেবারে পুনরুদ্রেক হয় নি। তার ঠিক আগের পর্যায়, আর একটু কিছু যদি মনে আনতে পারো তাহ'লেই কবিতাটার নাম মনে পড়ে। মনের এই অবস্থাকে বলা হয় পুনরুদ্রেক মুহূর্ত বা Condition of readiness।

পরিচিতি বা প্রত্যাভিজ্ঞা [Recognition]

সাধারণ অর্থে মনে করা বলতে যা বুঝি তার আলোচনা পুনরুদ্রেকের ভেতর পড়ে। কিন্তু এ রকম জিনিসও আছে যা আমরা আগেও দেখেছিলাম এখন দেখলে চিনতে পারি। এগুলোও স্মরণ ক্রিয়ার একটা অংগ। কোন একজন লোককে রাস্তায় দেখে যদি আমাদের মনে পড়ে যে ছোটবেলায় সে আমার সংগে স্কুলে পড়তো তখন তাকে বলি প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition)। প্রত্যাভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষণের একটা বিশেষ প্রকার হিসাবে আমরা বলতে পারি। পুনরুদ্রেকের সংগে প্রত্যাভিজ্ঞার পার্থক্য হ'ল যে—প্রথম প্রক্রিয়া কাজ করে বস্তুর অনুপস্থিতিতে এবং মানসিক কল্পের মধ্যে (Through formation of mental image)। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া কাজ করে বস্তুর উপস্থিতিতে। কতকগুলো জিনিসের মধ্যে যেটাকে আগে দেখেছিলাম সেটাকে চিনতে পারি, প্রত্যক্ষণের জন্য। এদিক থেকে প্রত্যাভিজ্ঞা, পুনরুদ্রেকের চেয়ে সহজ প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে দুটো

প্রক্রিয়াই আমাদের মধ্যে একসংগে কাজ করে। আমরা দেখে থাকি যে জিনিসের পুনরুদ্রেক করতে কষ্ট হচ্ছে সেই জিনিস সামনে থাকলে সহজে মনে করতে পারি। পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণ হ'য়েছে যে—যে কোন রকম বিষয় বস্তুরই স্মরণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যাভিজ্ঞা সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া।

ধারণ ক্রিয়া [Retention]

আমরা যা শিখি তার সমস্ত কিছুই আমাদের স্মৃতিতে থাকে না। যেটুকু আমরা ধারণ করতে পারি সেটুকু আমাদের স্মৃতি হ'য়ে দাঁড়ায়। ধারণ (Retention) বলতে আমরা বুঝি শেখার সংগে সংগে আমাদের মনে যা থাকে আর বিশেষ সময় পরে যা মনে থাকে তার মধ্যে পার্থক্য। খুব সহজভাবে বলতে গেলে বিশেষ সময় পরে আমাদের মন যা সঞ্চয় করে রাখ্তে পারে তাই হ'ল ধারণের পরিমাণ। আর এই ধারণ করে রাখবার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তাই হ'ল ধারণ-ক্রিয়া সাধারণ অর্থে আমরা একেই বলে থাকি স্মৃতি শক্তি। প্রথমে আমরা কিভাবে ধারণের পরিমাণ পরিমাপ করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো এবং পরে ধারণ প্রক্রিয়ার বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

স্মরণ শক্তি বা ধারণ ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি
[Methods of measuring Retention]

আমরা এখানে যে সব পদ্ধতিগুলোর আলোচনা করবো সেগুলো ধারণ ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি হলেও সাম্নে এদের প্রথম অংশগুলোর দ্বারা আমরা পরীক্ষার্থীকে শিক্ষা করাই। কারণ কোন জিনিস কতটা মনে আছে তা দেখ্তে হ'লে প্রথমে সেটা শেখার দরকার। তাই এই সব পদ্ধতির প্রথম অংশটাকে শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবেও বলতে পারি। এখানে আমরা কয়েক রকম পদ্ধতির কথা আলোচনা করবো।

[1] জ্যাকবস্ (Jacobs) 1787 খ্রীষ্টাব্দে স্মরণক্রিয়ার উপর একটা বিশেষ ধরনের পরিক্ষা করেন। তাঁর ধারণা ছিল আমরা হাতের মধ্যে যেমন পরিমাণ মত জিনিস ধরতে পারি ঠিক আমাদের স্মরণ করবার ক্ষমতারও একটা পরিমাণ আছে। একে তিনি বলেন স্মৃতির পরিসর (Span of memory) আমরা কোন জিনিস এক-বার দেখে বা শুনে যতটা নির্ভুল ভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারি তাকেই বলা হয় স্মৃতির পরিসর (Memory Span)। জ্যাকবস্ পরীক্ষা করেন অংকের সাহায্যে। পরীক্ষার্থীকে প্রথম কয়েকটি অংক সমষ্টি একবার বলে দেওয়া হয়। তারপর তাকে সেগুলো বল্তে অথবা লিখ্তে বলা হয়। এমনি করে প্রত্যেকবার উপস্থাপনে

একটা করে অংক বাড়িয়ে তাকে এক একবার দেখানোর বা শোনানোর পর পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। পরীক্ষার্থী একবার দেখে বা শুনে যতগুলো অংক ঠিকভাবে বল্‌তে পারে তাই হয় তার স্মৃতির পরিসর। এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে পরীক্ষার্থীকে যে অংকগুলো শোনানো হয় সেগুলো কোন বিশেষ সংখ্যা নয়। যেমন—932. এটা নয় শত বত্রিশ নয়। তাকে এই ভাবে শোনানো হয়—নয় তিন দুই ইত্যাদি।

[2] বীনে (Binet), হেন্‌রী (Henry), স্মিথ (Smith) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা জ্যাকবস্‌ এর এই নিয়মকে অনুসরণ করে একটা বিশেষ ধরনে পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষার্থীর স্মৃতি শক্তি পরিমাপের চেষ্টা করেন। জ্যাকবস্‌ যেমন পরীক্ষার্থী যতদূর না পারে ততদূর পর্যন্ত একটা করে অংক বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন এরা কিন্তু তা না করে পরীক্ষার্থীকে এক সংগে কতকগুলো অংক পরপর সাজিয়ে একবার দেখালেন বা শোনালেন। এর পর তাকে লিখ্‌তে বল্‌লেন। এতে পরীক্ষার্থী যত গুলো মনে রাখ্‌তে পার্‌লো তাই হ'ল তার ধারণ ক্ষমতা। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে তার স্মৃতির যা প্রকৃত পরিসর তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বিষয় বস্তু দেওয়া হয়। তার থেকে সে তার স্মরণ ক্ষমতা অনুযায়ী মনে রাখে একে বলা হয় ধারণ ক্রিয়া নির্ভর পদ্ধতি (Method of Retained number)।

[3] শিক্ষা পদ্ধতি (Learning method): ঠিক শিক্ষাপদ্ধতি বল্‌তে যা বোঝায় এটা তা নয়। এখানে শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতির পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি বহুদিন থেকে চলে আস্‌ছে এবং এর অনেক পরিবর্তনও হয়েছে। প্রথম যখন এই পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা করা হতো তখন তাকে একটা বিশেষ বিষয়বস্তু পড়্‌তে দেওয়া হতো এবং সেটা তার মুখস্থ করতে যত সময় লাগতো তাই হ'তো তার স্মরণ ক্ষমতা। আবার অনেকে সময় না মেপে কতবার পড়ার পর মুখস্থ কর্‌তে পারে তাই দেখা হ'তো। কিন্তু বেশ গণ্ডগোল থেকে যেতো। কারণ এমনও হ'তে পারে কোন পরীক্ষার্থী একেবারে স্থির হওয়ার জন্য কয়েকবার বেশী পুনরাবৃত্তিও কর্‌তে পারে। এতে তার সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই এই পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে এখন কাজে লাগান হয়।

এই পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে যে জিনিসটা শিখ্‌তে হবে সেটা একবার করে পড়ানো হয় আর প্রত্যেকবার পড়ার শেষে তার যা মনে আছে তা লিখ্‌তে বলা হয়। এমনি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সমস্ত জিনিসটা ঠিকভাবে লিখ্‌তে পারে ততক্ষণ এই ভাবে তাকে পড়ানো হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে

পারি পরীক্ষার্থী ঠিক কখন বিষয় বস্তুটা সম্পূর্ণভাবে শিখে ফেল্‌ছে। এই পদ্ধতির দ্বারা, অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর শিক্ষার সময় দেখে তুলনামূলকভাবে তাদের স্মৃতি শক্তির পরিমাণ কর্‌তে পারি।

(4) ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি (Prompting বা Anticipation method) : অনেকে শিক্ষা পদ্ধতি না ব্যবহার করে এই পদ্ধতি ব্যবহার কর্‌তে পছন্দ করেন। এতে, যে জিনিসটা শিখ্‌তে হবে সেটা পরীক্ষার্থীকে দু' তিনবার পড়ে শোনানোর পর তাকে বল্‌তে বলা হয় এবং যেখানে ভুল করে সেখানটা সংগে সংগে বলে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সবটা নিজে থেকে বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে করা হয়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে যতবার ভুল ধরিয়ে দিতে হয় সেই হিসাবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ বিচার করা হয়।

(5) সঞ্চয় পদ্ধতি (Saving method) : এই নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির (Learning method) সাহায্যে বিষয় বস্তুটি শেখানো হয়। তারপর কিছু সময়ের পার্থক্যে আবার তাকে সেই জিনিসটাই শিখ্‌তে বলা হয়। আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা আমাদের মনে থেকে যায়, ফলে দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময় কিছুটা কম সময় বা পুনরাবৃত্তি সংখ্যা কম লাগে। এই প্রথম আর দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময়ের মধ্যে শতকরা পার্থক্যকেই তার স্মৃতিশক্তির পরিমাপ হিসাবে ধরা হয়।

[6] প্রত্যভিজ্ঞা পদ্ধতি (Recognition method) : এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন বল্ডউইন (Baldwin), জ্যাঙ্গউইল (Zangwill), বেণ্ট্‌লি (Bently), হুইপ্‌লে (Whipple) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। পরীক্ষার্থীকে কতকগুলো জিনিস দেখানোর পর সে গুলোকে কতকগুলো নতুন জিনিসের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে বলা হয় তার ভেতর থেকে পুরানো জিনিসগুলোকে খুঁজে বের করতে। আগের জিনিসের সে শতকরা যত ভাগ খুঁজে বের করতে পারে তাই হয় তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ।

[7] পুনর্গঠন পদ্ধতি Reconstruction method) : মুন্‌স্টার বার্গ (Mzunsterberg), বিগ্‌হাম (Bigham), গাম্বল (Gamble) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষার্থীদের কতকগুলো জিনিস পর পর সাজিয়ে দেখানোর পর সেগুলোকে মিশিয়ে দেন। তারপর পরীক্ষার্থীদের বলেন যে ভাবে পর পর দেখানো হয়েছিল জিনিসগুলোকে ঠিক সেই ভাবে সাজাতে। যদি সাজানোতে ভুল থাকে আবার তাকে দেখানো হয় এবং তার পর সাজাতে বলা হয়। এই ভাবে যতক্ষণ

পর্যন্ত না ঠিকভাবে সাজাতে পারে ততক্ষণ পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষার্থীর ঠিক মত সাজাতে তাকে যতবার দেখাতে হয় তাই হয় তার স্মৃতি শক্তির পরিমাণ।

এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ এদের কিছু পরিবর্তন করে স্মরণক্রিয়া পরীক্ষার কাজে লাগান। তবে এবিংহস্ (Ebbinghaus) 'লা' (Luh), প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের ধারণ ক্ষমতা পরিমাপক পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তার বিভিন্ন পরীক্ষার্থী নিয়ে তাদের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতির পরিমাণ করেন। লা (Luh), ভুল সংশোধন পদ্ধতি, সঞ্চয় পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি, প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি আর পুনর্গঠন পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতির পরিমাপ করার পর তুলনামূলকভাবে দেখেন যে এদের মধ্যে ভুল সংশোধন পদ্ধতি (Anticipation বা Prompting method) হ'ল সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতি: আর প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি (Recognition method) হ'ল সব চেয়ে সহজ পদ্ধতি। লা (Luh) পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :-

যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল	20 মিঃ পরে শতকরা যতভাগ মনেছিল।
1. ভুল সংশোধন পদ্ধতি	68%
2. সঞ্চয় পদ্ধতি	75%
3. শিক্ষা পদ্ধতি	88%
4. পুনর্গঠন পদ্ধতি	90%
5 প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি	98%

কি কি জিনিসের উপর ধারণ ক্রিয়া নির্ভর করে? (Factors in Retention) : বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা, ধারণ ক্রিয়া কি করলে ভাল করা যায় এই নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধারণক্রিয়া কি কি জিনিস এর উপর নির্ভর করে তাই প্রথম পরীক্ষা করে দেখেন। তারা এই নিম্নলিখিত কারণগুলি আবিষ্কার করেন—

[1] শিক্ষার পরিমাণ (Amount of learning): ধর তুমি একটা কবিতা মুখস্থ করছো। যখনই তুমি একবার মনে সবটা আওড়াতে পারলে তখনই মুখস্থ হয়েছে বলে রেখে দিলে। আবার কিছুক্ষণ বাদে যখন মনে করলে তখন দেখলে কিছুটা ভুলে গেছ। এখন কবিতাটা আবৃত্তি করতে পারার পরও কয়েক বার পড়তে তোমার সময় লাগতো কিছু বেশী ঠিকই, কিন্তু একই সময় পরে দেখবে তুমি কম ভুলেছ। এবিংহস (Ebbinghaus), ক্রুজার (Krueger) প্রভৃতি

মনোবিজ্ঞানীরা এর সত্যতা প্রমাণ করেন। এবিংহস কতকগুলো অর্থহীন বর্ণ সমষ্টির তালিকা নিয়ে বিভিন্নটা ভিন্ন বার পুনরাবৃত্তি করে শেখেন। তারপর একই সময়ের তফাতে কোন্‌টা কত মনে আছে তা দেখেন। তার পরীক্ষার ফলাফল নীচের ছকে দেওয়া হ'ল। এই ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি একবার বেশী পড়ার জন্য আমাদের ধারণ প্রায় শতকরা একভাগ বেশী হ'য়েছে।

যতবার পড়া হ'য়েছিল	8	16	24	32	42	53	64
শতকরা যত ভাগ মনে ছিল	8%	16%	23%	32%	45%	54%	64%

তাহ'লে আমরা বলতে পারি শিক্ষার পরিমাণের উপর আমাদের ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। তবে এখানে একটা জিনিস বলার আছে সেটা হ'ল প্রত্যেক একবারের জন্য যদি 1% মনে থাকে তবে কোন জিনিস 100 বার পড়লে আমরা ভুলবো না। কিন্তু তা হয় না কারণ সব কিছুরই একটা সীমা (Limit) আছে।

[2] শিক্ষা পদ্ধতি (Method used in learning): আমরা সাধারণতঃ যখন একটা কবিতা মুখস্থ করি সেটা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না পড়ে, খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নিই। হয়তো এক একটা Stanza আলাদা আলাদা করে মুখস্থ করি। কিন্তু এতে ধারণ কম হয়। আমরা যদি একটা জিনিস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে শিক্ষা করি তাতে বেশী মনে থাকে পরিশ্রমও কম হয়। এই ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে শিক্ষা করাকে বলা হয় আংশিক পদ্ধতি (Part Method) আর এক সংগে সমস্তটা শিক্ষা করাকে বলা হয় সামগ্রিক পদ্ধতি (Whole method)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটা কবিতা বারবার সম্পূর্ণটা পড়ে মুখস্থ করলে আর খণ্ড খণ্ড করে মুখস্ত করলে তাদের মধ্যে ধারণের পার্থক্য হয় প্রায় 160%।

আবার আমরা সাধারণতঃ কোন কিছু মুখস্থ করতে হলে একেবারে বসে বার বার পড়তে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখস্থ হয়। কিন্তু একসংগে বহুবার না পড়ে যদি সময়টাকে ভাগ করে নেওয়া হয় তা হ'লে বেশী মনে থাকে। অর্থাৎ কোন কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে আমরা একই সংগে 16 বার না পড়ে যদি কিছু সময় বাদে বাদে চার বার করে পড়ি তা হ'লে বেশী মনে থাকে। এতে শিক্ষা যত তাড়াতাড়ি হয় ধারণও তত বেশী হয়। এক সংগে শেখা করাকে বলা হয় একত্রিত শিক্ষা

(Massed learning) আর সময় ভাগ করে পড়াকে বলা হয় সময় বিতরিত শিক্ষা (Distributed learning)। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি আর অর্থপূর্ণ কবিতা দুই এর উপর পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে বিতরিত শিক্ষায় আমাদের ধারণ বেশী হয়। তিনি 1500 শত শব্দ বিশিষ্ট একটি গদ্যের উপর পরীক্ষা করে দেখেন যে ঐ রকম গদ্য একদিনে পর পর চারবার না পড়ে যদি চার দিনে চার বার পড়া যায় তাহ'লে ভাল মনে থাকে ।

এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখার দরকার আমরা আংশিক পদ্ধতিতে অতীত বস্তুকে খণ্ড করছি আর বিতরিত পদ্ধতিতে সময়কে খণ্ড করছি। সুতরাং দু'টোর ভিতর তফাৎ মনে রাখবে।

এ ছাড়াও দেখা গেছে সক্রিয় শিক্ষায় (Active learning) নিষ্ক্রিয় শিক্ষায় (Passive learning) চেয়ে বেশী মনে থাকে। সক্রিয় শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি সেই সব শিক্ষাকে, যেখানে কিছুটা সময় আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়। একবারে আবৃত্তি না করে বারবার পড়ে শিক্ষা করকে নিষ্ক্রিয় শিক্ষা (Passive learning) বলে। কবিতা মুখস্থের সময় যদি একবার করে পড়ে কিছুটা মনে করার চেষ্টা করি এবং তারপর আবার পড়ি আবার মনে করি তাহ'লে আমাদের বেশী মনে থাকে। নীচে এবিংহসের একটা পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'ল এর থেকে বোঝা যাবে সক্রিয় শিক্ষা আমাদের কি পরিমাণে ধারণে সাহায্য করে।

আবৃত্তির সময়	চার ঘণ্টা পরে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল
সমস্ত সময় যখন শিক্ষার জন্য দেওয়া হ'য়েছিল (Passive)	15%
$\frac{1}{5}$ " " আবৃত্তির " " "	26%
$\frac{2}{5}$ " " " " " "	28%
$\frac{3}{5}$ " " " " " "	37%
$\frac{4}{5}$ " " " " " "	47%

[3] **অধীত বস্তুর পরিমাণ** (Amount to be learned) : মনোবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে একমত যে দু'টো মুখস্থ জিনিসের মধ্যে যেটার পরিমাণ বেশী কিছু সময় পরে যেটার পরিমাণ বেশী সেটা শতকরা বেশীভাগ মনে থাকে। একটা ছোট কবিতা আর একটা বড় কবিতা মুখস্ত করার ঠিক একই সময় পরে যদি

আবৃত্তি করি হয়তো আপাত ভাবে আমরা দেখবো যে ছোট কবিতা বেশী মনে আছে কিন্তু যদি শতকরা হিসাব করি তাহ'লে দেখবো যে বড়টারই বেশীর ভাগ মনে আছে। এবিংহস অর্থবিহীন বর্ণ সমষ্টির সাহায্যে পরীক্ষা করেও এই ফল পান। তার পরীক্ষার ফলাফল নিচে দেওয়া হ'ল।

তালিকায় যতগুলি শব্দ ছিল	প্রথম মুখস্থ করতে যত বার পড়তে হ'য়েছিল	একই সময়ে পড়ে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল
12	17	35%
24	45	49%
36	56	58%

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের ধারণক্রিয়া অধীত বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এর কারণ হিসাবে আমরা পুনরাবৃত্তির সংখ্যাকেও দায়ী করতে পারি; এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে তালিকায় শব্দ সংখ্যা বেশী হওয়ার সংগে সংগে আমাদের শিক্ষা করার জন্য পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও বাড়ছে। তবে এই বৃদ্ধির হারের তফাৎ আছে।

[4] **অধীত বস্তুর বিশেষত্ব** (Characteristics of the material) : অর্থপূর্ণ আর ছন্দময় জিনিস অর্থবিহীন বা গদ্যের চেয়ে বেশী মনে থাকে। এই কারণে আমাদের অর্থবিহীন শব্দের চেয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ বেশী মনে থাকে। আবার গদ্যের চেয়ে কবিতা বেশী মনে থাকে।

[5] **অধীত বস্তুর উজ্জ্বলতা** (Vividness) : ক্যালকিন্স্ (Calkins), জারশীল্ড্ (Jersield) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে সব জিনিস আমাদের পরিষ্কার অভিজ্ঞতা দেয় তারা বেশী মনে থাকে। একই জিনিস একটা বাজে হাতের লেখা থেকে পড়লে যা মনে থাকে একটা ভাল হাতের লেখা থেকে পড়লে তার থেকে বেশী মনে থাকে।

এই সব ছাড়াও অনেকে আরো কতকগুলো ধারণের কারণ বলেছেন, যেমন— অধীত বস্তুর উপস্থাপনের কাল। এখানে আর এগুলো আলাদা করে আলোচনা করার দরকার নেই। উপরে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেই সমস্ত বলা হ'য়েছে। এর পর আমরা স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলবো।

স্মরণ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় (Economic Method of **memorization**) :—

স্মৃতি

স্মৃতি শক্তি বাড়ানো সম্ভব কিনা অনেকে জিজ্ঞেস করেন। অনেক সাধারণ লোকের ধারণা আছে স্মরণ শক্তি বাড়ানো যায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা এই ধারণায় বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে স্মরণক্রিয়া একটা মানুষের সহজাত গুণ, এটাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। তবে যাতে স্মরণক্রিয়া ভালভাবে কাজ করে তার জন্য কতকগুলো উপায় মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন। এগুলোকে স্মৃতি শক্তি ঠিকভাবে কাজে লাগানোর উপায় (Memory training) বলতে পারি। এদের স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর উপায় বললে ভুল হবে। আসলে এর দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে যে ভুল থাকে তা শুধরানো যায়। এই গুলো হল ঃ—

[1] আমরা যদি কোন জিনিস মুখস্থ করতে চাই তার উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং সব সময়ে একটা বিশেষ মানসিক ইচ্ছা রাখতে হবে যে আমাদের মুখস্থ করতে হবে।

[2] এখন যে জিনিস শিখতে চাইছি তার সংগে পূর্বের শেখা কোন জিনিসের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি শেখা যায়।

[3] কোন কিছু মনে রাখতে হ'লে তার ছন্দ ঠিক রেখে পড়তে হবে, এবং বার বার আবৃত্তি করতে হবে। এই ছন্দ আর আবৃত্তি আমাদের তাড়াতাড়ি মুখস্থ করায় সাহায্য করে।

[4] কোন জিনিস এক সংগে অনেকবার পড়লে আমাদের বিরক্ত লাগে। এতে মুখস্থ করার ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্য কিছু সময়ের তফাতে তফাতে পড়া ভাল (বিতরিত শিক্ষা)।

[5] প্রথমে সমস্তটা মনে রাখার চেষ্টা না করে একটা সারাংশ মনে রেখে, তারপর সমস্থটা মুখস্থ করা উচিত। অর্থাৎ বুঝে মুখস্থ করলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়।

[6] শেখার পর সারাংশটা লিখে ফেলা উচিত।

[7] শেখার পর বিভিন্ন বন্ধুর সংগে ঐ বিষয় আলোচনা করলে ভাল মনে থাকে।

[8] একটা কিছু শেখার পর কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার দরকার। ঘুমোতে পারলে আরো ভালো হয়। তা নাহ'লে একটা জিনিস শেখার পর একই ধরনের আর একটা জিনিস শিখলে দুটোই আমরা গুলিয়ে ফেলি। যদি বিশ্রাম সম্ভব না হয় তাহ'লে ভিন্ন ধরনের বিষয় পড়া উচিত।

বিস্মৃতি [Forgetting]

আগেই বলেছি সারাজীবন ধরে যা শিখি তার সবকিছু আমাদের মনে থাকে না।

কিছু শেখার পর যত সময় যেতে থাকে বা আমরা যত নতুন জিনিস শিখতে থাকি তখন আগের শেখা জিনিসগুলোর আর সব কিছু মনে থাকে না। একে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি ভুলে যাওয়া (Forgetting)। এবিংহস প্রথম এই ভুলে যাওয়ার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করেন তার উদ্দেশ্য ছিল কতটা আমরা ভুলি, কি পরিমাণে ভুলি, কতটাই আমাদের মনে থাকে, এই সব আবিষ্কার করা। তার পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল এইরূপ :—

তিনি প্রথমে কতকগুলো অর্থবিহীন বর্ণসমষ্টি (Nonsense syllable) তৈরী করেন। তারপর সেগুলোকে 13 টা, 13 টা করে কয়েকটা তালিকা (List) করেন। এই রকম আটটা তালিকা তিনি মুখস্থ করেন। এতে তার সময় লাগে 18 থেকে 20 মিনিট। তারপর কিছুক্ষণ সময় পরে আবার তিনি সেটা মুখস্থ করেন। এতে কিছুটা সময় বাঁচে, তার কারণ আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা মনে ছিল। এরকম বিভিন্ন সময়ের তফাতে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন প্রত্যেকবার পুনঃশিক্ষার সময় কিছুটা জিনিসের কিছুটা অংশ মনে থাকে। যে তালিকা তার প্রথম দিন শিখতে লেগেছিল 1010 সেকেণ্ড একমাস বাদে তাই মুখস্থ করতে লাগে 803 সেকেণ্ড। অর্থাৎ 207 সেকেণ্ড সময় কম লাগছে। বা, আগে যা সময় লেগেছিল তার শতকরা 20·5 ভাগ বেঁচেছে এক মাস পরে। তার পরীক্ষার ফলাফল নীচে ছকে দেওয়া হ'ল।

শেখার যত সময় পরে আবার শিখেছিলেন	শতকরা যত সময় বেঁচেছিল
$\frac{1}{3}$ ঘণ্টা	58·2%
1 „	44·2%
8·9 „	35·8%
24 „	33·7%
2 দিন	27·8%
6 „	25·4%
1 মাস	21·1%

এবিংহস লেখচিত্রের সাহায্যে তার পরীক্ষার ফলাফল দেখান। x অক্ষে সময়ের পার্থক্য y অক্ষে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল তা ধরে তিনি লেখ-চিত্র আঁকেন। এই লেখচিত্র হ'তে দেখা যায় যে প্রথমে, অর্থাৎ, শেখার সংগে

সংগে এই রেখা তাড়াতাড়ি নেমে আসে। পরে সময়ের পার্থক্যের সংগে সংগে এই বাঁক কমতে কমতে ঐ রেখা প্রায় x অক্ষের সামান্তরাল হয়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় আমরা যখন কোন অধীত বস্তুকে ভুলে যাই তার বেশীর ভাগটাই ভুলি
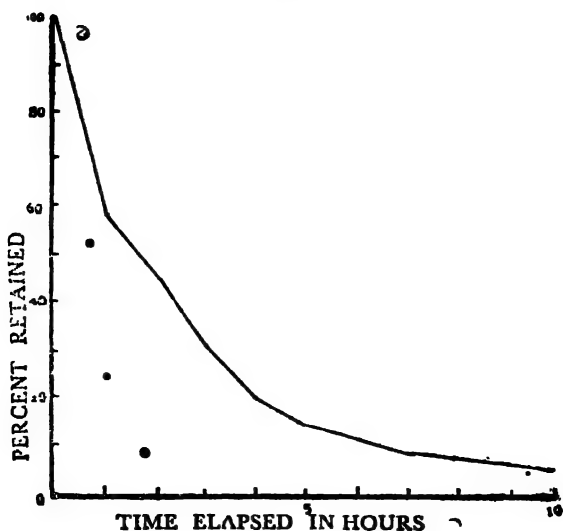
Curve of Forgetting

শেখার সংগে সংগেই, তারপর ভুলে যাওয়ার হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এবিংহসের পর 1913 খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রং (Strong), 1930 খ্রীষ্টাব্দে বোরাস্ (Boras) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ভুলের হারের ওপর পরীক্ষা করে একই রকম ফল পান। তাদের প্রত্যেকের লেখই এইরূপ হয়। একে বলা হয় বিস্মৃতির লেখ (Curve of forgetting)।

অনেক মনোবিজ্ঞানী ঐ বিস্মৃতির লেখ আঁকবার সময় x অক্ষ শুধু সময় না ধরে সময়ের লগারিদম ধরেন। তাতে দেখা যায় যে লেখটি একটি অবনত সরল রেখা (Inclined straight line) হয়। এর থেকে তারা বিস্মৃতির লগারিদম সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্র হ'ল—কোন বিশেষ সময় (t) পরে আমাদের মনে রাখার পরিমাণ এক মিনিট/ঘণ্টা পরে যা মনে থাকে তার এবং 10, মিনিট ঘণ্টায় যা মনে থাকে তার সংগে সময়ের (t) লগারিদমের গুণফলের অন্তর ফল। অর্থাৎ কোন সময়, (t) পরে মনে ধারণের পরিমাণ, R—এক মিনিট পরে যা মনে আছে (A)—10 মিনিট পরে যা মনে থাকে (B) × log t বা, $R = A - B \log t$।

অনেক সময় পরীক্ষার ভুল থাকার জন্য লগারিদম সূত্র অনুসারে ফল পাওয়া যায় না।

বিস্মৃতির কারণ (Causes of Forgetting) : আমরা কেন ভুলি—এ একটা বিশেষ সমস্যা। অবশ্য ভুলে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। তা না হ'লে ছোটবেলা থেকে যে সব অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা যদি সব মনে থাকে আমাদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে। আর তাই যদি হ'তো তাহ'লে নতুন জিনিস আমরা শিখতে পারতাম না। তাই আমরা শিখিও যত ভুলিও তত। তাই এই বিস্মৃতকে স্মরণক্রিয়ার একটা অংগ হিসাবে ধরা যায়। তবে তার মানে এই নয় যে আমরা যা কিছু শিখি সবই ভুলে যাই। সমস্ত কিছুতে ভুলে যাওয়াও যেমনি বিপদজনক আবার মনে রাখাও তেমনি বিপদ। তাই এই দুটো প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত। আর প্রত্যেক মানুষের বেলায় তা হয়ও। কি হারে আমরা ভুলি সে কথা আগেই বলেছি। এখন বলবো কেন ভুলি। ভালভাবে ধারণ করার কারণগুলোর উল্টো-গুলোকে আমরা ভোলার কারণ হিসাবে ধরতে পারি। তাছাড়া কতকগুলো জিনিস আছে যেগুলো আমাদের বিস্মৃতিতে সাহায্য করে, সেগুলো হ'ল :—

[1] **অতীত বস্তুর গুণ** : যে সব জিনিস শিখতে দেরী হয় তাদের ভুলিও সহজে। গদ্য আমরা কবিতার চেয়ে বেশী হারে ভুলি।

[2] **ঠিক মত না শেখা** : যে সব জিনিস আমরা কমবার অভ্যাস করি সেগুলো তাড়াতাড়ি ভুলি। যেমন আমরা আমাদের নাম কোন সময় ভুলি না তার কারণ হ'ল, বার বার ব্যবহারের ফলে ওটা আমাদের বেশী শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্য একজনের নাম আমরা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। আবার যে বন্ধুর সংগে বহুদিন থাকি তার নামটা সহজে ভুলি না। কিন্তু কয়েকদিনের আলাপে যার নাম জানি তাকে ভুলে যাই।

[3] **মস্তিষ্কে আঘাত দরুণ অচৈতন্য হওয়া** (Shock Amnesia) : আমাদের স্মরণক্রিয়া নির্ভর করে আমাদের মস্তিষ্কের কাজের ওপর। তাই মস্তিষ্কে যদি কোন গণ্ডগোল হয় আমাদের ধারণ ক্ষমতা লোপ পায় ফলে আমরা ভুলে যাই। ধর, তোমার কোন বন্ধুর ফুটবল খেলতে খেলতে মাথায় খুব আঘাতের ফলে অচৈতন্য হয়ে গেল। তারপর শুশ্রূষা করার পর তার চেতনা ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবে সে খেলার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। এতে অবশ্য খুব বেশী আগের ঘটনাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। এরকম দুর্ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে স্মৃতি একেবারে লোপ পায়।

[4] **ওষুধের ক্রিয়া :** অনেক সময় খুব বেশী ওষুধ খেলে, মদ খেলে স্মৃতি লোপ পায়। যে সব ওষুধ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোকে খারাপ করে দেয় সেগুলো আমাদের ভোলার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

[5] **রেট্রো অ্যাকটিভ ইনহিবিসান** (Retroactive inhibition) কোন কিছু জিনিস শেখার পর, আবার কোন নতুন জিনিস শিখলে দেখা যায় যে শেষটা কিছুটা প্রথমটাকে ভুলিয়ে দেয়। তুমি পর পর দুটো কবিতা মুখস্থ করলে দেখবে যে যখন প্রথম কবিতাটা আবৃত্তি করার চেষ্টা করছো তখন তার ভিতর দ্বিতীয়টার কোন কোন কথা চলে আসছে। একে মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Retroactive inhibition। এর ফলে দেখা গেছে আগের কবিতাটা বেশী ভুলি।

[6] **দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের প্রভাব** (ঘুমের উপকারিতা): এবিংহস্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তিনি এমনি যা ভোলেন ঘুমালে তার চেয়ে কম ভুলেন। ডেলেনবাক্ (Dallenbach) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন কিছু শেখার পর আমরা যত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারি তত বেশী মনে থাকে। তিনি দুজন পরীক্ষার্থীকে অর্থহীন বর্ণসমষ্টি তালিকা মুখস্থ করিয়ে কতকবার তাদের সংগে সংগে ঘুম পাড়িয়ে তারপর কতটা মনে আছে দেখেন, আর কতকবার তাদের যথাযথভাবে অন্য কাজ করতে গিয়ে তারপর কতটা মনে আছে দেখেন। এতে দেখা যায় একই সময়ের তফাতে ঘুমের পর তাদের বেশী মনে থাকে। নীচে তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'লো।

	এক ঘণ্টা পর	দুই ঘণ্টা পর	চার ঘণ্টা পর	আট ঘণ্টা পর
অন্য কাজ করার পর শতকরা যত ভাগ মনেছিল	46%	31%	22%	9%
ঘুমানোর পর শতকরা যত ভাগ মনে ছিল	70%	51%	55%	56%

তাঁর এই পরীক্ষা থেকে ডেলেনবাক্ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রথম আমরা যে শতকরা বেশী ভাগ ভুলি তার কারণ হ'ল ঘুমাতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত Retroactive inhibition এর কথাই জোর করে বলে। দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজ অন্য কাজের মনে রাখায় ব্যাঘাত ঘটায়।

[7] **অবসাদ** (Fatigue) : খুব বেশী সময় ধরে কাজ করলে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। ঠিক্ এমনি খুব বেশীক্ষণ মানসিক কাজ করলে আমাদের মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। ফলে এই অবস্থায় আমরা যা শিখি তা তাড়াতাড়ি আমরা ভুলে যাই। এই শিক্ষার পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না। আসলে অবসাদ নয় সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা থাকে না বলে আমরা ভুলে যাই।

[8] ফ্রয়েড এবং তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে ভোলাটা আমাদের ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ আমরা ভুলতে চাই বলে ভুলি। তাঁদের মত হ'ল আমরা জীবনের সমস্ত অপ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলোকে ভুলতে চাই। তবে এই সব ভুলে যাওয়াকে আমরা ধারণক্রিয়ার অভাব হিসাবে ধরতে পারি না। এই সব ঘটনার অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের অবচেতন মনে অবদমিত থাকে এবং ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে আনা যায়। তাই এর আলোচনা এখানে না করাই ভাল।

QUESTIONS

1. "Learning is a gradual process"—Discuss.

2. What do you mean by learning ? What are the Condition of economic learning ?

3. How are past experiences recalled ? Why is recognition necessary for complete memory ?

4. Describe the factors in the process of memorising. Is any thing once learnt ever completely forgotten ?

5. Describe in brief the various processes involved in memorisation. (W. B H. S. 1960)

6. What is memory ? State and explain different factors involved in memorising.

7. What do you understand by forgetting ? State and explain different causes of forgetting.

8. Why do we forget ? How recall and recognition are different ?

9. Discuss the nature and the causes of forgetfulness.

10. What are the marks of a good memory ? Discuss

how far memory of a person can be improved by practice.

11. What are the causes of forgetfulness ? Explain—"Forgetfulness is an aid to memorization."

12. State and explain the logerithimic law of forgetting.

13. What do you mean by the forgetting ? Find out the most economical method of memorising a lesson.

14. Write short notes on :—

(a) Nonsense-Syllable ; (b) Trial and error learning ; (c) Insightful learning ; (d) Whole & part learning ; (e) Massed & Spaeed learning ; (f) Memory Span ; (g) Memory training (h) Direct and indirect recall ; (i) Recalling names ; (j) Condition of readiness ; (k) Learning method ; (l) Saving method ; (m) Anticipation method ; (n) Reconstruction method.

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

কল্পনা

[Imagination]

ধর, তুমি রামায়ণে রাবণের বর্ণনা পড়ছো। তার দশটা মুখ, 20টা চোখ ইত্যাদি। সংগে সংগে তোমার মনে একটা মানুষের ছবি ভেসে উঠেছে। একটা শরীরের সংগে বা ধড়ের সংগে পর পর দশটা মাথা লাগানো। এই যে ছবি আমাদের মনে আসছে তাকে আমরা বলছি কল্পনাগত ভাবমূর্তি। এই কল্পনা-গত ভাবমূর্তি সৃষ্টির পেছনে যে মানসিক ক্রিয়া কাজ করে তাকে বলছি কল্পনা (Imagination)। রাবণকে আমরা কোনদিনই দেখিনি। কিন্তু তার বিবরণ পড়ে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলো জিনিসকে দিয়ে তার কল্পনা আমরা করি নি। মনের একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকে—যা দিয়ে আমরা যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তা রেখে দিতে পারি ভবিষ্যতের জন্য। ার এই ক্ষমতাব বিকৃত বহিঃপ্রকাশ হয় কল্পনার মাধ্যমে। বিকৃত বলার কারণ কল্পনার কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে এর উৎপত্তি। নরসিংহের চিন্তা করলে আমরা একটা মানুষের ধড়ের কথা ভাবি এবং তার ওপর একটা সিংহের মাথা বসিয়ে দেই। আমরা সিংহ দেখেছি। মানুষও দেখেছি। কিন্তু সিংহ মানব কোনোদিন দেখিনি। তাই নরসিংহের দেহের বর্ণনা যখন পড়ি তখন মানুষ এবং সিংহ সম্বন্ধে অতীত ধারণা থেকে আমরা একটা বিশেষ মূর্তির কল্পনা করি। এই অর্থে আমরা এইগুলোকে বিকৃত বলেছি। তাহ'লে খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে কল্পনা হ'ল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের সচেতন মনে অবস্থিত অতীত অনুভূতি ও ধারণাগুলোকে ইচ্ছামত জুড়ে একটা নতুন জিনিস তৈরী করে চেতন মনে আনি। এগুলো আমাদের চেতনাতে আনে ভাবমূর্তি (Image) অথবা প্রত্যক্ষ (Percept)-এর আকারে।

কল্পনা বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি কোন জিনিসের প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে সৃষ্টি করা। আরো সংকীর্ণ অর্থে বলতে পারি—আমাদের বিভিন্ন বস্তুর বা ঘটনার যে সব স্মৃতি থাকে সেগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে একটা নতুন জিনিসের

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা। আবার এই কল্পনায় যে বস্তুর আমরা প্রতিবিম্ব দেখি তার কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। ছবির সাহায্যে এই যে অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু আমরা দেখি তার নাম হ'ল কল্পনা।

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক

[Relation between Memory and Imagination]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মৃতি আর কল্পনাকে বিশেষ ভাবে আলাদা করার প্রয়োজন। তাই তাদের সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করবো। স্মৃতি আর কল্পনা এই দু'রকম মানসিক প্রক্রিয়াই আমাদের প্রতিবিম্বের সাহায্যে নিতে হয়। দুটোই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে টেনে আনে। অবশ্য খুব সাধারণভাবে এ কথাও বলতে পারি স্মৃতি আমাদের কল্পনার বস্তুর যোগান দেয়। যেমন—কোন লোককে স্মরণ করার মানে তাকে আমি আগে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, সেই ধারণাকে মনে আনা। আবার যখন মৎস্য কন্যার কথা কল্পনা করছি তখন মানুষ আর মাছ এই দুই সম্বন্ধে অতীত ধারণাকে কাজে লাগাচ্ছি। শুধু মাছের মাথাটার সংগে মানুষের মাথাটা বদলে নিচ্ছি মনে মনে।

আবার সাধারণ প্রত্যক্ষণে আমাদের চিন্তাধারায় যেমন সময় (Time), স্থান (Spae): কারণ ও ফলাফল সব কিছু কাজ করে তেমনি স্মৃতি আর কল্পনার এই দুটো প্রক্রিয়ায়ও এই সব গুণগুলো থাকে।

সুতরাং এই দুটো দিক থেকে স্মৃতি আর কল্পনার মধ্যে বেশ মিল আছে। কিন্তু পার্থক্যও তাদের মধ্যে আছে। যেমন—

স্মৃতিতে আমাদের অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। ঘটনার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমনটি আগে শিখেছিলাম বা দেখেছিলাম তাই মনে পড়ে কিন্তু কল্পনায় ঘটনা বিকৃত হয়। আগে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে, একটা মানুষকে আমি ঠিক যে ভাবে দেখেছিলাম সেই ভাবেই মনে করতে পারি। কিন্তু যখন মৎস্য কন্যার কথা কল্পনা করি তখন বিভিন্ন ঘটনাকে এক সংগে মিশিয়ে একটা অবাস্তব জিনিস তৈরী করি।

আবার স্মৃতির একটা বিশেষ অংগ হ'ল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা (Recognition)। কিন্তু কল্পনাতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ যা আমি কোনদিন দেখি নি যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাকে চেনার কোন কথা উঠে না।

যতই সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্য তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, স্মৃতি আর কল্পনা দু'টো

আলাদা প্রক্রিয়া তবে তারা প্রায় সব সময়েই মিশে থাকে। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুর দৃশ্যের স্মৃতির সংগে কিছু না কিছু কল্পনা জড়িয়ে থাকবেই। আবার যে কোন কল্পনার মধ্যে স্মৃতি থাকবেই। এই কারণে এদের আলাদা করে বেছে আলোচনা করা খুবই কঠিন।

কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক

[Relation between Imagination & Thought]

কল্পনা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে [illegible] করার পূর্বে আর একটা মানসিক [illegible] যার সংগে এর পার্থক্য করা [illegible] চিন্তন ক্রিয়া (Thinking)। সাধারণতঃ আমরা চিন্তা, স্মৃতি [illegible] এক সংগে মিশিয়ে [illegible] প্রথমে এদের সম্বন্ধে আলাদা [illegible]। তাই এখানে আমরা খুবই সংক্ষেপে কল্পনা আর চিন্তার মধ্যে [illegible] সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

কল্পনা আমাদের [illegible]। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার [illegible] হ'ল আমাদের কল্পনার উপাদান [illegible] কিন্তু চিন্তার উপাদান হ'ল ধারণা (Percept)। অর্থাৎ চিন্তন ক্রিয়ায় আমরা [illegible] অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করি। সুতরাং চিন্তা হ'ল বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আর কল্পনা হ'ল যুক্তি বিহীন মানসিক প্রক্রিয়া। আবার আমাদের চিন্তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য (Goal) থাকে আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা একটা বিশেষ পথে অগ্রসর হই। কিন্তু কল্পনার কোন বাঁধাধরা পথ বা উদ্দেশ্য নেই। চিন্তার একটা ফলাফল আছে। অর্থাৎ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে আমরা সমাধান খুঁজে পেতেও পারি বা নাও পেতে পারি। কিন্তু কল্পনার কোন ফলাফল থাকে না। কারণ কল্পনা হ'ল উদ্দেশ্যহীন। চিন্তার জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কল্পনায় আমাদের মন খুব শিথিল থাকে। চিন্তা হ'ল প্রত্যক (Abstract)। কিন্তু কল্পনা হ'ল দেহধারী (Concrete)। আবার চিন্তার একটা বিশেষ গুণ হ'ল যে এটা সংঘবদ্ধ (Systematised) কিন্তু কল্পনা একেবারে বিছিন্ন (Isolated)।

উপরের ঐ আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি কল্পনা আর চিন্তন ক্রিয়া হ'ল দুটো আলাদা মানসিক প্রক্রিয়া। তবে সাধারণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা সব কিছুকেই বুঝাই। যখন বলি "আমি রামের কথা চিন্তা করছি।" তখন ঠিক চিন্তা ক্রিয়ার কথা বলি না। রামকে আমি আগে দেখেছি—এখন তার কথা চিন্তা করছি, অর্থ হ'ল তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করছি। এটা হ'ল স্মরণক্রিয়া। আবার যখন বলি "আমি আমার বাড়িটা নতুন করে তৈরী করার চিন্তা করছি"। তখন আমরা স্মরণ

বা চিন্তন ক্রিয়ার কথা বলি না। এটা হ'ল কল্পনা। কারণ যে নতুন ধরনের বাড়ি হবে তার কোন অতীত বা বর্তমান অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন্তাকে আমরা দুরকম অর্থে ব্যবহার করি। যদিও এটা বৈজ্ঞানিক অর্থে ভুল তবুও এর পেছনে কারণ আছে। কোন কিছু নতুন চিন্তা করার জন্য আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্থাপন বা স্মৃতির যেমন প্রয়োজন হয় আবার কল্পনারও তেমন প্রয়োজন হয়। স্মৃতি আমাদের প্রত্যভিজ্ঞায় (Recognition) সাহায্য করে আর কল্পনা আমাদের নতুন পথের সন্ধান দেয়। এই দুয়ে মিলে আমাদের চিন্তার পথ নির্দেশ করে। এই আলোচনা থেকে বলতে পারি চিন্তা হ'ল কল্পনার চেয়ে আরো বিস্তৃত প্রক্রিয়া। সুতরাং এই আলোচনা আর বিস্তৃত হওয়ার দরকার নেই। তবে তোমার এইটুকু জানলেই চলবে। মনে রাখার সুবিধার জন্য চিন্তা এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য নীচে ছকের আকারে দেওয়া হ'ল।

কল্পনা (Imagination)	চিন্তা (Thought)
1. কল্পনার উপাদান হ'লো প্রতিমূর্তি (Image)	1. চিন্তার উপাদান হ'লো ধারণা (percept)
2. কল্পনা বিচারবিহীন মানসিক প্রক্রিয়া	2. বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া
3. উদ্দেশ্যবিহীন	3. উদ্দেশ্যযুক্ত
4. কল্পনার কোন ফলাফল নেই	4. চিন্তার ফলাফল আছে
5. কল্পনা মনের শিথিল অবস্থায় উদ্ভূত	5. চিন্তার জন্য গভীর ইচ্ছাকৃত মনোযোগের (Voluntory attention) প্রয়োজন
6. কল্পনা দেহধারী (Concrete)	6. চিন্তা প্রত্যয়ক (abstract)
7. কল্পনা বিশৃঙ্খল	7. চিন্তা সুসংবদ্ধ (Systemetised)
8. কল্পনা বিচ্ছিন্ন গুণের হ'তে পারে।	8. কিন্তু চিন্তা সামগ্রিক (General) গুণের হয়।

কল্পনার উপাদান

[Elements of Imagination]

এ পর্যন্ত আমরা কল্পনার সংগে স্মৃতি আর চিন্তার তফাৎ করলাম। এখন আমরা বল্‌বো এই কল্পনার জন্য কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কল্পনা করার পূর্বে প্রথমতঃ আমাদের দরকার কল্পিত বস্তু সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা। যখন আমরা পরীর কল্পনা করছি তখন জানার দরকার তার দেহের গঠন কি রকম।

একটি সুন্দরী মেয়ের শরীরে দুটো ডানা আছে তা দিয়ে উড়ে যেতে পারে। তারপর আমাদের প্রয়োজন স্মৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার। বিভিন্ন মেয়ে কি রকম দেখ্‌তে তার থেকে খুঁজে বের করা কে সুন্দরী। আবার কোন পাখার ডানা বড় এবং দেখ্‌তে সুন্দর। এই সব আমরা পাবো আমাদের স্মৃতির কাছ থেকে। সব শেষে দরকার একটা মানসিক চেষ্টা যার দ্বারা অতীতের এই সব অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে নিয়ে, সাজিয়ে একটা নতুন জিনিস তৈরী কর্‌বো। এখানে আমরা বিশেষ একটা মেয়েকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে একটা বিশেষ পাখীর ডানা লাগিয়ে আমরা পরীর কল্পনা করি। তাহ'লে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে কল্পনার জন্য দরকার—(1) যে বস্তুকে কল্পনা কর্‌বো তার সম্বন্ধে একটা আবছা ধারণা। (2) অতীত অভিজ্ঞতা, আর (3) অতীত অভিজ্ঞতা গুলোকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলবার মানসিক চেষ্টা।

উপরের এই আলোচনা থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছো আমাদের কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার ওপর। আমরা যা ইচ্ছা তাই কল্পনা করতে পারি না। এর একটা সীমা আছে। কল্পনা নির্ভর করবে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রসারের (Range of past experiences) উপর। আমি যা কোনদিন দেখি নি বা শুনিনি তা নিয়ে কল্পনা করতে পারি না। অন্ধ লোক যে কোনদিন মানুষ অথবা পাখী দেখেনি তার পক্ষে পরীর কল্পনা করা অসম্ভব। তেমনি যারা কালা তারা কোনদিন স্বরের কল্পনা কর্‌তে পারে না। এই কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর করে স্মৃতির উপর—স্মৃতি প্রবল হ'লে কল্পনা করা সম্ভব। যে জিনিসের অভিজ্ঞতা আমি ভুলে গেছি তা আমাদের কল্পনায় কোনদিন আস্‌তে পারে না। আবার কল্পিত বস্তুর গঠন বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। আমি কল্পিত পরীকে একরকম দেখ্‌তে পারি আবার অন্য জনে অন্য রকম দেখ্‌তে পারে।

এখানে আর একটা কথা বলে কল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শেষ কর্‌বো। কল্পনা হয় ভাবমূর্তির মাধ্যমে। এটা হ'ল ইন্দ্রিয়াত বস্তুর জ্ঞান। কিন্তু আমরা জানি ভাবমূর্তি যে কোন ইন্দ্রিয়ের হ'তে পারে। তেমনি কল্পনাও যে সব সময় দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভর একথা ভুল। ভাবমূর্তিও যেমনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের হ'তে পারে কল্পনাও তেমনি যে কোন ধরনের ভাবমূর্তিকে অবলম্বন করে হ'তে পারে। সুরকার যখন নতুন গানের সুর ঠিক করেন তখন আগের শোনা ভিন্ন গানের সুরের অংশকে এক সংগে মেশান। এমনি স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ সব রকমেরই কল্পনা কর্‌তে পারি। এ সম্বন্ধে আলোচনা ভাবমূর্তির মধ্যে অনেক করা হয়েছে।

কল্পনার শ্রেণী বিভাগ

[Classification of Imagination]

মানুষের সমস্ত কল্পনা গুলোকে আমরা কয়েকটা বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। আমরা যে সব কল্পনা করি তাদের প্রকৃতিগতভাবে চারটা শ্রেণীতে প্রথম ভাগ করবে।

(1) ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা। এদের সাধারণতঃ বলা হয় ইন্দ্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কল্পনা (Active & Passive imagination)

(2) মৌলিকতা ও কৃত্রিমতা পূর্ণ কল্পনা (Creative or Artificial imagination)

(3) বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য জনিত কল্পনা

(4) বিশ্বাস জনিত ও বিশ্বাস মুক্ত কল্পনা (Imagination with and without belief)

এখন আমরা এদের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো।

(1) **ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা :** আমাদের কল্পনা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দুই হ'তে পারে। যখন আমরা অলসভাবে বসে থাকি তখন আমাদের মনে নানা রকম ঘটনার প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়। এই সব ঘটনাকে মনে আনার জন্য আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টা করি না। একে বলে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা বা নিষ্ক্রিয় কল্পনা (Passive imagination)। দিবাস্বপ্ন (Day dream) কল্পনাবিলাস (fantasy) এই ধরনের নিষ্ক্রিয় কল্পনা। আদিম যুগের মানুষের এবং বেশীর ভাগ শিশুদের চিন্তাধারা এই রকম হয়। আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও চিন্তা ধারা অনেক সময় নিষ্ক্রিয় হয়।

অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করেই বিভিন্ন জিনিস কল্পনা করি। ধর ভাবছি আমাদের গরুর বাচ্চা হ'লে কি রকম রং হবে। গরু কত দুধ দেবে, বাচ্চাটা কি করবে ইত্যাদি। এখানে আমরা নিজের ইচ্ছায় কল্পনা করি। এই প্রকার কল্পনাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত কল্পনা বা সক্রিয় কল্পনা (Active imagination)। এখানে আমরা নিজেরা চেষ্টা করি কিছু সুখকর জিনিস কল্পনা করার। তবে এ নয় যে সক্রিয় কল্পনা সব সময় সুখকর হয়। অনেক সময় দুঃখদায়ক কল্পনাও সক্রিয় কল্পনা হয়।

সাহিত্য সৃষ্টি অথবা যে কোন উদ্ভাবনী চিন্তার পেছনে এই দুই রকম কল্পনাই এক সাথে কাজ করে।

(2) **মৌলিকতা ও কৃত্রিমতা পূর্ণ কল্পনা** :—কল্পনাকে আমরা ভাবমূর্তির স্বরূপ দেখে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

যখন মানসিক প্রতিবিম্ব কল্পনাকারী নিজে থেকে সৃষ্টি করে তখন তাকে বলি মৌলিক কল্পনা বা রচনাত্মক কল্পনা (Creative imagination)। একটা জিনিস মনে রাখার দরকার যা আগেও একবার বলেছি যে কল্পনা যত মৌলিকই হউক না কেন যে কল্পনা করছে তার নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে হতে পারে না। এর মৌলিকতা কল্পনাকারীর মানসিক ভাবমূর্তির সংস্থা। কবির কল্পনা, শিশুর কল্পনা, দার্শনিকদের চিন্তা এই শ্রেণীর কল্পনার মধ্যে পড়ে।

আমরা যখন অন্যের সাহায্য নিয়ে কল্পনা করার জন্য তখন সেই কল্পনাকে বলবো কৃত্রিম কল্পনা বা গ্রহণাত্মক কল্পনা (Artificial বা receptive imagination)। বইয়েতে কোন জায়গায় হাওড়ার পুলের বিবরণ পড়তে পড়তে যখন আমাদের মনে পুলের না দেখা পুলের একটা ছবি ভেসে ওঠে তখন সেই কল্পনাকে বলি কৃত্রিম কল্পনা। একটা সহজ উদাহরণ দিলে তোমরা মৌলিক আর কৃত্রিম কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। রামায়ণ বাল্মীকির মৌলিক কল্পনা (Creative imagination) উদ্ভূত। কিন্তু আমরা যখন রামায়ণে বর্ণিত অশোক বনে বন্দিনী সীতার বিবরণ পড়ি তখন আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা হ'ল কৃত্রিম কল্পনা।

(3) **বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য জনিত কল্পনা** :—অনেক সময় আমরা বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কল্পনা করি। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই সব কল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। সাধারণতঃ আমরা এদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—(A) জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনা (Intellectual imagination), (B) সৌন্দর্য বোধ ফুটাবার উদ্দেশ্যে কল্পনা (Aesthetic imagination) আর (c) কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)।

(A) কোন জিনিসের প্রকৃতরূপ বুঝতে বা জ্ঞান লাভ করতে আমরা যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলা হয় জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনা (Intellectual imagination)। অর্থাৎ কল্পনা যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সাহায্য করছে তখন সেই কল্পনাকে বলছি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনা। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকরা এই কল্পনাকে আশ্রয় করে নতুন জ্ঞানের বিষয় বুঝতে চেষ্টা করেন। এই কল্পনা আবার মৌলিক অথবা কৃত্রিম দুইই হ'তে পারে। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেছিলেন তখন তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মৌলিক কল্পনা (Creative intellec-

tual imagination) কাজে লাগিয়েছিলেন। আবার আমরা জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কোন বই পড়ি অর্থাৎ কোন বই থেকে জ্ঞান লাভের জন্য যে কল্পনার আশ্রয় তখন আমরা জ্ঞানার্জনের জন্য কৃত্রিম কল্পনার (Receptive intellectual imagination) আশ্রয় নিই।

(B) আমরা যে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নতুন কিছু শিল্প সৃষ্টি করি বা কোন শিল্প সৃষ্টিকে উপভোগ করি তাকে বলা হয় সৌন্দর্য বোধ তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কল্পনা (Aesthetic imagination)। কবি এবং শিল্পীরা সাধারণতঃ এই কল্পনার আশ্রয় নেন। এই সৌন্দর্য বোধ আশ্রিত কল্পনা আবার মৌলিকও হ'তে পারে বা কৃত্রিমও হতে পারে। কবি বা লেখক কোন জায়গার বর্ণনা করতে গিয়ে যে কল্পনার আশ্রয় নেন তাকে বলা হয় সৌন্দর্য বোধ আশ্রিত মৌলিক কল্পনা (Creative aesthetic imagination)। আর আমরা সেই বর্ণনা পড়ার সময় যে কল্পনার আশ্রয় নিই তাকে বলা হয় সৌন্দর্য বোধ আশ্রিত কৃত্রিম কল্পনা (Receptive aesthetic imagination)।

(c) যে কল্পনার সাহায্যে আমরা কোন বস্তুর কোন সমস্যার সমাধান করি তাকে বলা হয় কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)। এই কল্পনার সাহায্য বেশী নেন ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, আর রাজনীতিবিদ্‌রা। কোন বাঁধ তৈরী করার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা তার ছবি আঁকেন, নক্সা তৈরী করেন। আনুমানিক খরচের হিসাব করেন। তারপর বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু হয়। এই যে কল্পনার সাহায্যে তিনি বাঁধ তৈরীর কাজে এগুলেন, একেই বলা হয় কার্যকরী কল্পনা (Practical imagination)।

(4) **বিশ্বাস জনিত বা বিশ্বাস মুক্ত কল্পনা :** কল্পনা আবার দুরকম হ'তে পারে বিশ্বাস্য আর অবিশ্বাস্য। কোন কল্পনায় যখন প্রতিচ্ছবি (image) প্রকৃত (Real) হয় বা আমরা বিশ্বাস করি তখন তাকে বলা হয় বিশ্বাস্য কল্পনা (Imagination with belief)। ধর, আমরা কল্পনা করছি বরফ দিয়ে ঢাকা হিমালয়ের চূড়ার। এই জিনিসটা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা সত্যি জানি যে হিমালয়ের চূড়া বরফ দিয়ে ঢাকা। যখন সৌরমণ্ডলের কল্পনা করি এবং মনে মনে ভাবি কি ভাবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে আর চাঁদ কিভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, আরো সব গ্রহ নক্ষত্র কিভাবে অবস্থান করছে তখন এই কল্পনাকে বলি বিশ্বাস্য কল্পনা (Imagination with belief)। কারণ আমরা এই সব ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাস থেকে এই কল্পনার উৎপত্তি।

এই ধরনের কল্পনাকে আমরা বিশেষ তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(a) ঐতিহাসিক কল্পনা (Historical imagination), (b) প্রতীক্ষা (Expectation বা anticipation), (c) বৈজ্ঞানিক কল্পনা (Scientific imagination)।

(a) যখন অতীতের কোন বস্তু যাকে আমরা সত্য বলে জানি, তার কল্পনা করি তখন তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক কল্পনা (Historical imagination)। সিন্ধু সভ্যতার বিবরণ পড়তে গিয়ে তখনকার দিনের আচার আচরণের যে কল্পনা আমরা করি তাকেই বলবে ঐতিহাসিক কল্পনা। কল্পনা মাত্রই অতীত অভিজ্ঞতার হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা বলতে আমরা সেই সব কল্পনার ঘটনাকে বলছি যে সব ঘটনাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ইতিহাস যেমন সত্য, এই সব কল্পনার বস্তুগুলোও সত্য।

(b) প্রতীক্ষা (Expectation) হল কোন দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের মনের মধ্যে ভবিষৎ সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি বা প্রতিচ্ছবি (image) সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া। আমরা মনে মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কল্পনা করি যে আমরা ধরেনি যা ভাবছি তাই ঠিক হবে। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা নিজেদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করতে থাকি। যেমন পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল বের হওয়ার আগে আমরা ভাবি ফেল করবো, এবং সংগে সংগে আরও কল্পনা করতে থাকি কি ভাবে আর সবাই এর সংগে মিশবো, কথা বলবো, কি বলবো—কেন ফেল করেছি, ইত্যাদি। কতকগুলো মানসিক প্রক্রিয়া মিলে আমাদের মনে এই জাতীয় কল্পনার সৃষ্টি করে। ধর এই পরীক্ষার ফলাফলের কথাই বলি। প্রত্যেকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন। প্রত্যেকেই চায় নিজের ভবিষ্যৎ ভাল করে গড়ে তুলতে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর এটা অনেকটা নির্ভর করে। এই ফেল হবার ইচ্ছাই সে মনে মনে কল্পনা করে যে সে ফেল হবে। এবং ফেল হ'লে ভবিষ্যতে তা খারাপ হবে। তারপর সে ভাবে তার এই যে ধারণা সে ফেল হবে এটা নিশ্চয়ই সত্যি এবং তখন সে তার জন্য নিজেকে মানসিক দিক থেকে তৈরী করতে থাকে। তাহলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি প্রতীক্ষা (Expectation) এর জন্য দরকার—(1) একটা গঠন মূলক কল্পনা (Constructive imagination), (ii) ভবিষ্যতের সংগে এই কল্পনার একটা সংযোগ, (iii) একটা বিশ্বাস যে এই কল্পনা সত্য হবেই (iv) এই কল্পিত ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিজেকে তৈরী করা। এই সবগুলো একসংগে মিলে আমাদের মধ্যে প্রতীক্ষার (Expectation বা anticipation) সৃষ্টি করে।

কল্পনা
[Imagination]
সক্রিয়
(Active)
নিষ্ক্রিয়
(Passive)
মৌলিক
(Creativc)
কৃত্রিম
(Receptive)
বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য
জনিত কল্পনা
বিশ্বাস্য
(With belief)
অবিশ্বাস্য
(Without belief)
বুদ্ধি আশ্রিত
(Intellectual)
সৌন্দর্য বোধ ফুটাবার
জন্য কল্পনা
(Aesthetic)
কার্যকরী
(Practical)
ঐতিহাসিক
(Historical)
প্রতীক্ষা জনিত
(Expectation)
বৈজ্ঞানিক
(Scientific)
মৌলিক
(Creative)
কৃত্রিম
(Receptive)
মৌলিক
(Creative)
কৃত্রিম
(Receptive)
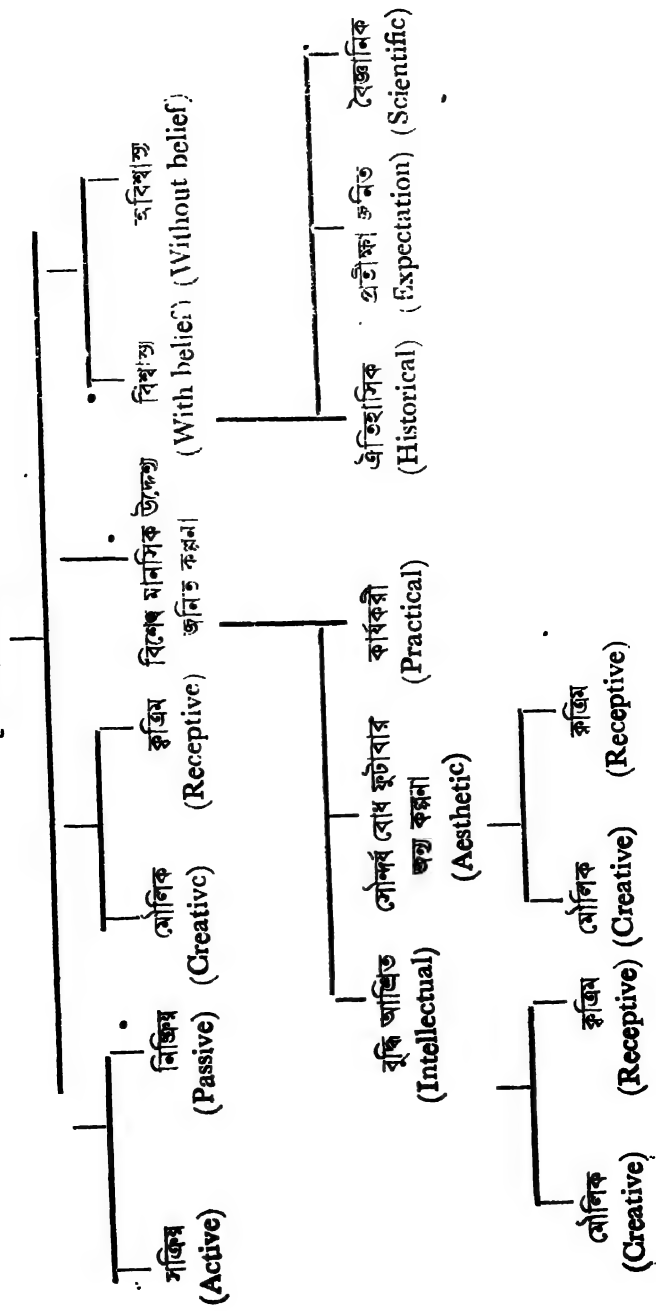
(c) আগে যে দু'রকমের বিশ্বাস্য কল্পনার আলোচনা করলাম সেই দু'টোই কালাশ্রিত (Has reference to time)। অর্থাৎ প্রথমটি অতীতের বস্তুর কল্পনা আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যত বস্তুর সম্বন্ধে কল্পনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পনা হ'ল কালাতীত। এর কোন বিশেষ ধরনের কাল নেই। যে কোন যুগের জন্যই সত্য। এই কল্পনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা আপাতঃ দৃষ্ট ভিন্ন (Apparently different) ঘটনাগুলোর মধ্যে মূল সূত্র অনুসন্ধান করেন। এই বৈজ্ঞানিক কল্পনা সব সময়েই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। নিউটন এই বৈজ্ঞানিক কল্পনার দ্বারাই মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

এই গেল সংক্ষেপে বিশ্বাস উদ্ভূত কল্পনার কথা। আবার এমনও কল্পনা হ'তে পারে যে প্রতিবিম্বগুলি একেবারে মিথ্যা বস্তুর। এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব তো নেই তা ছাড়া আমরা নিজেরাও বিশ্বাস করি না। এই গুলোকে বলা হয় অবিশ্বাস্য বা বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা (Imagination without belief)। যখন আমরা আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়ি তখন আমাদের মনে এই ধরনের কল্পনা হয়।

কল্পনার বৃদ্ধি
[Development of Imagination]

আমাদের বয়স বাড়ার সংগে সংগে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই আমাদের কল্পনা শক্তি বাড়ে। তোমরা জান কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তাই অভিজ্ঞতা এবং বয়স বাড়ার সংগে সংগে আমাদের কল্পনা শক্তিও উন্নত হ'তে থাকে। ছোট বেলা আমাদের থাকে নিষ্ক্রিয় কল্পনা। বেশীর ভাগ কল্পনা বিলাস (Fantasy)। ছোট ছেলেরা ধুলো নিয়ে ভাত রান্না করে। পুতুলকে আদর করে খাওয়ায়। কিন্তু যত আমাদের বয়স বাড়তে থাকে যখন আমরা পড়াশুনা করি, নতুন নতুন জিনিস সম্বন্ধে জানতে পারি তখন ঐ ছোট বেলার কল্পনা চাপা পড়ে যায়। এর বদলে আসে বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বা কার্যকরী কল্পনা। জানার আকাঙ্খা থেকেই এই সব কল্পনার উৎপত্তি হয়। আরো যখন বয়স বাড়ে অর্থাৎ পরিণত বয়সে (Matured age) কল্পনা আরো উন্নত হয়। পরিপক্ক জীবনে বেশীর ভাগ থাকে সৌন্দর্য বোধ জাগাবার কল্পনা (Aesthetic imagination), বুদ্ধি আশ্রিত কল্পনা (Intellectual imagination)। সুন্দরকে উপলব্ধির মধ্যে বা সত্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়েই এই বয়সের কল্পনা প্রকাশ পায়।

কল্পনা শক্তি বৃদ্ধির উপায়
[Methods of developing imaginative power]

আগে কল্পনার বৃদ্ধির যে কথা বললাম ওগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়। শিক্ষার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হ'ল মানুষের মধ্যে কল্পনাশক্তি বাড়ানো। কারণ কল্পনা আমাদের কিছুটা সাহায্য করে। এই কল্পনাশক্তি বাড়ানোর জন্য কতকগুলো নিয়ম পালন করা হয়।

(a) যে কোন জিনিস খুব নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শেখানো।

(b) ভ্রমণ কাহিনী, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ বেশী করে পড়ানো।

(c) সৌন্দর্যবোধ আনার জন্য ভাল ভাল ছবি দেখানো। ভালো কবিতা এবং কল্পনা মূলক লেখা পড়ানো।

(d) বাজে কল্পনা করতে উৎসাহ না দেওয়া।

কল্পনার সুফল ও কুফল

[Uses and Abuses of imagination]

কল্পনা যদি ঠিক ভাবে চালিত হয় তবে এগুলো আমাদের জীবনের উন্নতির কারণ হয়; আর যদি না হয় কল্পনাই আমাদের জীবনের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। অতিরিক্ত কল্পনা বিলাস আমাদের জীবনের সর্বনাশের কারণ। এককথায় কল্পনাকে যদি আমরা ঠিক মত চালনা করতে পারি তাহলেই ভাল কিন্তু যদি কল্পনা আমাদের চালনা করে তাহলে মুস্কিল।

QUESTIONS

1. What do you mean by imagination? What mental materials are required for imagination?

2. What is meant by imagination? What are the similarities and dissimilarities that exist between imagination & memory?

3. What are the special characteristics of imagination as constracted with memory and thinking?

4. Define imagination. How many types of imagination are there? Write in brief what do you know about them.

5. How imagination develops with age? And how imaginative power can be developed? Indicate the ways in which imagination may help human life.

6. Write short notes on :—

(a) Passive and active imagination, (b) Creative and relective imagination, (c) Intellectual imagination, (d) Expectation, (e) Scientific imagination.